অপরাজিতা

শারদ সংকলন ◆ নবম সংখ্যা
১৪৩২ বঙ্গাব্দ ◆ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

Tejgaon Sanatan Samaj Unnayan Parishad

TVS
টিভিএস অটো বাংলাদেশ এর
পক্ষ থেকে
শারদীয় শুভেচ্ছা
TVS RAIDER
THE WICKED RIDE
TVS NTORQ 125
PLAY SMART
TVS Auto Bangladesh
www.tvsabl.com
TVS Bangladesh
01919194222, 01919189111
Scan to
know more

অপরাজিতা

শারদ সংকলন, নবম সংখ্যা, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

Tejgaon Sanatan Samaj Unnaayan Parishad

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা

সংকলন উপ-কমিটি, ২০২৫

আহ্বায়ক
প্রকাশ আদিত্য

সদস্য সচিব
অশোক ধর

সদস্য
দীপক লাল কর্মকার
প্রদীপ কুমার সাহা
সঞ্জীব মৈত্র
অসীম কুমার দাশ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন
প্রদীপ কুমার সাহা

প্রকাশনায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রণে
বর্ণ প্রিন্টার্স
আরামবাগ, ঢাকা।

ভালোবাসায় মাখামাখি হবে জীবন,
এটা ভাবনার বিষয় না,
স্বপন ছোঁয়ার অদম্য ইচ্ছে ধরে রাখতে হবে।
স্বপ্নগুলো পিছুটানে, সময় বদলায়,
জীবনের রঙ ও পাল্টে যায়...

বছর জুড়ে কতই পূজো হয় কিন্তু সবটাকে ছাড়িয়ে যায় আশ্বিনের এ দুর্গাপূজা। সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মহালয়া জানান দেয় মা আসছে।

সকল আয়োজন শেষে, আমাদেরও মনযোগ থাকে, অপরাজিতাকে কতোটা সুন্দর করা যায়। পূজা অনুষ্ঠানের মহাযজ্ঞ, নানা প্রতিকূলতার মাঝেও নবম সংস্করণ প্রকাশের প্রচেষ্টায় সাধারণ সদস্য থেকে শুরু করে উপদেষ্টা কমিটি, নির্বাহী কমিটি, শুভানুধ্যায়ী, লেখা প্রদানকারী, বিজ্ঞাপনদাতা, সকল পৃষ্ঠপোষকসহ সবাইকে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সময় স্বল্পতায় মুদ্রণজনিত প্রমাদ তা এ আহ্বায়ক কমিটির, আরেকটু বেশি ভালো করার সদিচ্ছার পরও আমাদের সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

জয় মা দুর্গা।

শারদ শুভেচ্ছা

আহ্বায়ক
অপরাজিতা উপ-কমিটি, ২০২৫

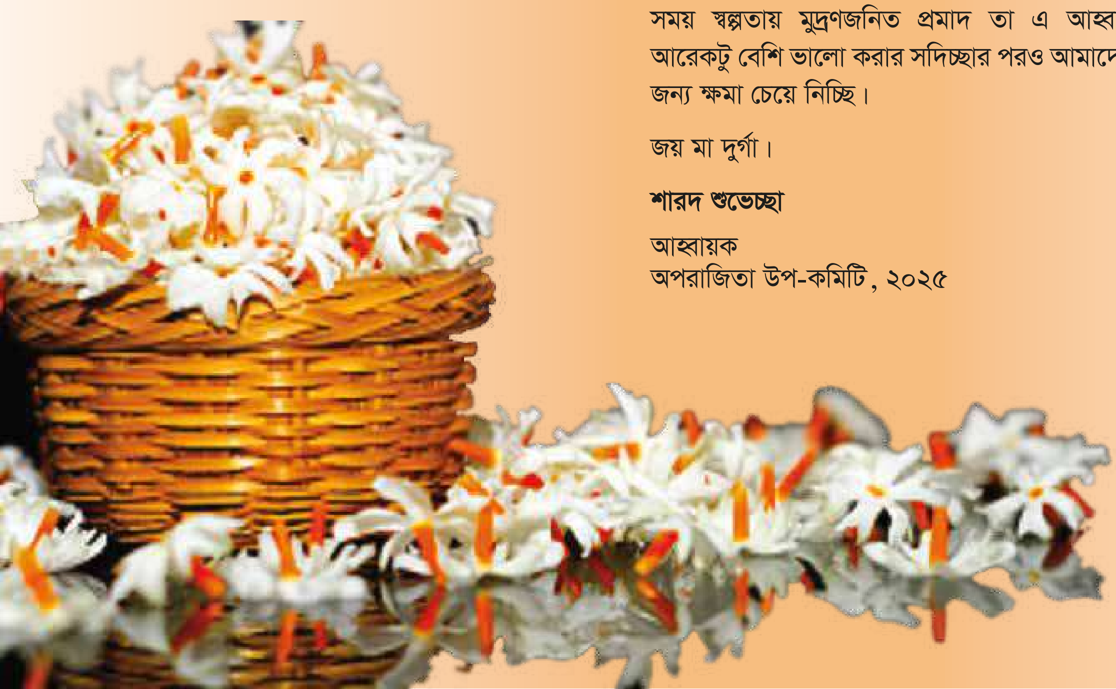

অপরাজিতা

শারদ সংকলন ♦ নবম সংখ্যা ♦ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী ৮
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ ২০
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি) ২২
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র ২৬
শারদীয় দুর্গাপূজা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব ৩৩
দুর্গাপূজা, প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং নবপত্রিকা ৩৬
শারদীয় দুর্গোৎসব: অকালবোধন থেকে সর্বজনীন মহোৎসব ৩৯
সমকালীন বিশ্বে গীতা-ভাবনা ৪১
উৎসবের দুর্গাপূজা ৫১
৫৩ মহালয়ার মহাতত্ব
৫৫ প্রসঙ্গ: দুর্গাপূজা
৫৬ পঞ্চতত্ত্ব
৫৮ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিত্রে "ধর্ম"
৫৯ দেবল কুমার দাশ এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ
৬২ শারদীয়ার মাহাত্ম্য ও কুমারী পূজা
৬৩ বাবা গনেশ ও কর্মে কেন অমানুষ
৬৬ তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ
৭২ "অপরাজিতা"-র বিগত সংখ্যার প্রচ্ছদসমূহ

SOURAV'S CAPTION

Pallabi's_Capture

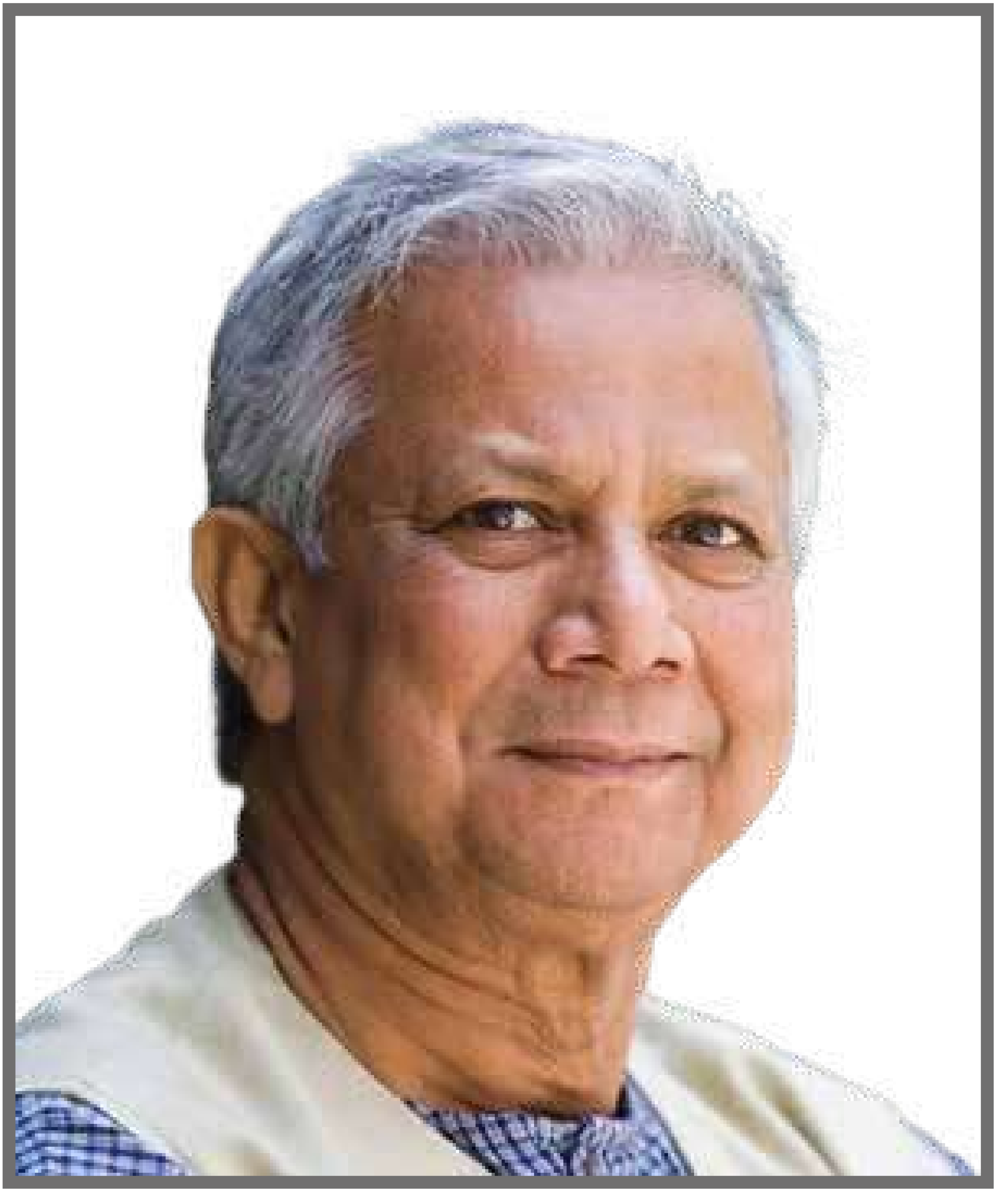

প্রধান উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ আশ্বিন ১৪৩২
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাণী

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। হিন্দু ধর্মমতে জগতের মঙ্গল কামনায় দেবী দুর্গা স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন এবং ভক্তদের কল্যাণ সাধন করে শত্রুর বিনাশ ও সৃষ্টিকে লালন করেন। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের এই আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের তাৎপর্যকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের অপূর্ব মেলবন্ধনের অনন্য নিদর্শন বাংলাদেশ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সকলের পরিচয় আমরা বাংলাদেশি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই ধারাকে সমুন্নত রেখে এবারের দুর্গাপূজাও সারাদেশে নির্বিঘ্নে এবং যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে বলে আমি আশা করি।

শান্তি, মৈত্রী ও সাম্য সকল ধর্মের মূল উপজীব্য। মানুষের কল্যাণসাধনই সব ধর্মের মূল শিক্ষা। তাই নিজ নিজ ধর্মের যথাযথ অনুশীলনের পাশাপাশি মানুষে মানুষে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহমর্মিতা বজায় রেখে সমাজে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার যে অগ্রযাত্রা শুরু করেছি, তার সফল বাস্তবায়নে ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সকল অশুভ, অন্যায় আর অন্ধকারকে পরাজিত করে শুভ চেতনার জয় হবে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে- দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে এই প্রার্থণা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক 'অপরাজিতা' শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শারদীয় দূর্গোৎসব হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সনাতন ধর্মীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই উৎসবকে ঘিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। তারা নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে প্রফুল্ল মনে ধর্মীয় উপাচার ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এদেশে আবহমানকাল থেকে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। আমি আশা করি, আগামী দিনগুলোতে এদেশের মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য আরো দৃঢ় ও অটুট হবে এবং আমরা সকলে মিলে জুলাই বিপ্লবের চেতনায় একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ানুগ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো।

আমি 'অপরাজিতা' শীর্ষক স্মরণিকার শারদ সংকলনের সাফল্য কামনা করি।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

আশীর্বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ‘অপরাজিতার’ নবম সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

সনাতন ধর্ম কখনো ‘জড়’ বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। সনাতন ধর্ম জগতে সমস্ত কিছুর মধ্যেই চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছে। ‘জড়’ বলে যাকে অন্যেরা অভিহিত করে সনাতন ধর্মের মতে তা চৈতন্যেরই প্রকাশভেদ মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানও আজ একথা বলছে। একইভাবে সনাতন ধর্ম কখনো কোন জীবকেই ‘জীব’ বলে দেখেনি। ‘জীব’ আসলে ব্রহ্মই, অজ্ঞানবশত ‘জীব’ জানে না যে সে ‘ব্রহ্ম’। জীবই শিব এই অদ্ভুত সমীকরণ পৃথিবীকে সনাতন ধর্মই প্রথম উপহার দিয়েছে।

সনাতন ধর্ম তার অনুসারীদের চেতনাকে স্কুল থেকে সুক্ষের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করছে। জড়ের শক্তিকে অস্বীকার করে চৈতন্যের শক্তিকে আবিষ্কার করতে সর্বতোভাবে প্রণোদিত করছে। ভুলোকের ধুলিকে ঝেড়ে ফেলে দ্যুলোকের সৌরভকে অঙ্গে মাখতে অনুপ্রাণিত করছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের পরিসমাপ্তি একত্বের আবিষ্কারে এবং একত্বের উপলব্ধিতে। পূজার মতো এই লোকপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সনাতন ধর্ম সকল সাধারণ মানুষকে এই একত্বের উপলব্ধিতে উৎসাহিত করছে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হলো মাতৃভাবে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা আমাদের চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। হৃদয়ের পরিপূর্ণ শুদ্ধ হলে আমরা জগতের একত্ব উপলব্ধি করি।

জগজ্জননীর নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করি যেন আপনাদের স্মরণিকা সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়।

স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

সতত শুভানুধ্যায়ী,

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক

আহ্বায়ক
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট

শুভেচ্ছা বাণী

কাঁশফুলের স্নিগ্ধতা আর শিউলিফুলের গন্ধমেখে প্রকৃতিতে নতুনভাবে সেজে ওঠে শরতকাল। মহালয়ার অপার মুগ্ধতায় সকলে আহ্বান জানাই দেবী দুর্গাকে।

নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্য আর অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে বিশ্বের নানা প্রান্তের সঙ্গে বাংলাদেশেও উদযাপিত হয়ে আসছে শারদীয় দুর্গাপূজা। বাঙালি হিন্দুদের আকাঙ্ক্ষিত প্রধান ধর্মীয় উৎসব।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে বিগত সময়ের মতো এবারও মহাআনন্দের সঙ্গে দুর্গা মায়ের পূজার আয়োজন করছে। এ সমগ্র আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপকমিটি, সকল ভক্তবৃন্দ, সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় এবং জাতীয় নেতৃবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা এবং উপদেশ ও আর্থিকসহায়তা প্রদানকারী সকলকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পূজা আয়োজনের পাশাপাশি এ উপলক্ষ্যে শারদ সংকলন 'অপরাজিতা'-র নবম সংখ্যা প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই।

আমি আশা করি, সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদে উদযাপিত হবে।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

রমেশ দত্ত

সভাপতি
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

শারদোৎসবে আনন্দবাণী

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাণের উৎসব দুর্গোৎসব– শুধু বৃহত্তম ধর্মীয় আয়োজনই নয়, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও মানবচেতনার এক অপূর্ব সমন্বয়ের উৎসব। যে উৎসব পশুশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করে, মাতৃআরাধনায় এই আর্তিই ধ্বনিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বারো মাসে তেরো পার্বণ, কিন্তু শারদীয় দুর্গাপূজা এমন এক ধর্মীয় আয়োজন যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ সম্পৃক্ত হন। দুর্গতিনাশিনী, অসুরদলনী দুর্গা মর্ত্যে আসেন। তাঁর আগমণে ধরিত্রী শুধু আনন্দধারায় মুখর হয় না, সত্য ও সুন্দরের আলোয়ও উদ্ভাষিত হয়।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে পশুশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই, দৈত্য দলন এবং এক মানবিক আলোকিত সমাজ গড়ে তোলার তাগিদে মাতৃশক্তির আরাধনার সূচনা হয়। ইতিহাস বলে, সময় পরম্পরায় জগজ্জননী দুর্গার আরাধনা নানাপ্রান্তে শক্তিপূজার ধারা তৈরি করে, বাঙালির শারদোৎসব পুরোপুরি বাঙালি ঘরানার আয়োজন। বাংলায় দুর্গাপূজার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দশভূজা দেবী দুর্গা। তাঁর ডানদিকের পাঁচ হাতের মধ্যে প্রধান ডান হাতে থাকে ত্রিশূল; ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত অন্য চার হাতে থাকে যথাক্রমে খড়গ, সুদর্শন চক্র, তীর-ধনুক এবং বজ্র। তাঁর বাম দিকে পাঁচ হাতে (ওপর থেকে নিচে) থাকে যথাক্রমে হাঁস, একটি ঘন্টা, যমদন্ড এবং সর্পাকৃতির লম্বা দড়ি বা পাশা। প্রধান বাম হাত ত্রিশূল দ্বারা অসুর বধে সহায়তা করে। ত্রিশূলবিদ্ধ বুক নিয়ে মৃত অবস্থায় মহিষাসুর দেবী দুর্গার পদতলে পড়ে থাকে। দুর্গাপূজার বিশিষ্টতা হচ্ছে অন্যান্য দেব-দেবীর মতো তিনি একা পূজা পান না। একদল দেব-দেবীর সাথে তাঁর পূজা করা হয়, যার মধ্যে তাঁর ডান পাশে রয়েছে ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী এবং সাফল্যের দেবতা গণেশ। দেবীদূর্গার বাম পাশে রয়েছে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতী এবং দেববাহিনীর প্রধান ময়ূরের ওপর অধিষ্ঠিত কার্তিক। দুর্গাপূজা তাই একটি আদর্শ বাঙালি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমৃদ্ধ ঐক্যবন্ধনের প্রতীকস্বরূপ।

রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের পাশবিক শাসনের অবসান ও মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আবহমান কাল ধরে যে শক্তি জাগ্রত বিবেকের উদ্বোধন ঘটায় যুগে যুগে, কালে কালে তারই আরেকটি অধ্যায়। কিন্তু অন্ধকার পশুশক্তি নির্মূল হয়নি। তারই হিংস্র থাবায় বারংবার রক্তাক্ত হচ্ছে এই মাটি। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ আর্তনাদ থেকে সূচিত এক প্রতিবাদী অধ্যায়। মাতৃআরাধনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও মুক্তির শক্তি বিকাশে সমঅধিকারের বার্তা দিতে সেই প্রবহমান সুর তৈরি করেছে নতুন ব্যাঞ্জনা।

শান্তি ও সম্প্রীতির চেতনা বিকশিত হোক, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদার দাবি আরও পল্লবিত করুক- এই কামনা করি শারদোৎসবে। প্রকাশনা হোক তারই বার্তাবহ।

শুভেচ্ছাসহ

বাসুদেব ধর

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা

শারদীয় দুর্গোৎসব সনাতন ধর্মীয় বাঙালির উৎসব হলেও আজ এটা সর্বজনীনধারায় এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

এ উৎসবের মাধ্যমে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। চিরায়ত দেবী বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের অসুরীয় শক্তির বিনাশ। এই চেতনাকে ধারণ করে বাঙালি তার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দেন মা দুর্গাকে। মা দুর্গা হলেন দশভুজা। এই দশভুজা দুর্গার হাতে বধ হলো অসুর, জয় হলো দেবকুলের। অশুভ শক্তি পরাজিত হলো। কালের বিবর্তনে সময়ের পরিবর্তনে তার রূপ এখন ভিন্নতর। কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দেবকুলের মতো মানুষকে একত্রিত হয়ে অপতৎপরতাকে বিনাশ করতে হবে।

মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মের ঊর্ধ্বে ভ্রাতৃত্ববোধ, কল্যাণ চিন্তা, অধিকারবোধের চেতনাকে বিকশিত করা এখনও মানুষের মধ্যে প্রবল। তথাপি কখনো কখানো অসুরীয় শক্তির উত্থান বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আতংকগ্রস্ত করে তোলে; ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পবিত্র ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে সাধারণ মানুষকে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। আবারও এই দেশে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধতার অসুররা বুঝি ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। এই ধর্মান্ধ কায়েমি স্বার্থবাদীগোষ্ঠীকে যেকোনো মূল্যে রুখে দিতে হবে, প্রতিহত করতে হবে।

ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ দেখতে চাই।

সবধর্মের মূল বাণী মানবকল্যাণ। আবহমান বাংলার ঐহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্মের মূল বাণী আমাদের সত্য সুন্দরের পথ দেখাক। প্রত্যেক পুজো সত্যসুন্দরের আলোতে আলোকময় হয়ে উঠুক। সকল বৈষম্য বঞ্চনার অবসান ঘটুক। গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার জয় হোক। বিশ্বমানবতার জয় হোক।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

সন্তোষ শর্মা

সভাপতি
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

সভাপতির শুভেচ্ছা

এক ক্রান্তিকালে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মাতৃবন্দনায় আজ আমরা শামিল হয়েছি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে বিজয় আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম, সেই বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক চেতনা আমাদের মধ্যে আবার ধ্বনিত হোক। আমাদের প্রশ্ন একটাই– বারবার কেন আমাদের মধ্যে হতাশার করুণ রাগিণী বাজবে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধারা কেন বারবার রুদ্ধ করার চেষ্টা হবে? আবার ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার অসুররা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, অন্ধকার গাঢ় করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই অবস্থা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাম্য হতে পারে না। অন্ধকারের এই অপশক্তি চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। একটি মহল পবিত্র ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে মানুষকে এক গভীর সংকটের অনিশ্চিত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করতে চাইছে। এই অবস্থার জন্য দায়ী গোড়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, অতীতমুখিন রাজনীতি। এখন যুক্তি ও প্রযুক্তির যুগ। আমরা সবাই অসাম্প্রদায়িক ও আলোকিত ঐতিহ্যের অংশীদার। এই ঐতিহ্য আমাদের মনে আলোরবর্তিকা হয়ে কাজ করবে।

শারদীয় দুর্গোৎসব শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার অংশ নয়; বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল চেতনাকে ধারণ করেই এ উৎসবের বিকাশ। 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। সার্বজনীনতা এই উৎসবের প্রাণ। হাজার বছরের ঐক্যবোধ এই উৎসবের শক্তি। সমাজের প্রত্যেক মানুষই পুজোর অংশ। আমরা দেবীর আরাধনার মধ্যদিয়ে অসুর শক্তির বিনাশ চাই; অসুন্দর ও অসত্যের ধ্বংস চাই। আত্মশক্তির উদ্বোধন চাই।

সম্প্রতি এক ধর্মান্ধ শক্তি বিভিন্ন অজুহাতের ধুয়ো তুলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। পবিত্র মন্দিরে ঢুকে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস করেছে। এই হামলার উদ্দেশ্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা। আতঙ্ক তৈরি করা। সংখ্যালঘুদের জায়গা জমি সম্পদ দখল করা। এই অশুভ শক্তি সামনে আরও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের এ ব্যাপারে আরো বেশি সজাগ থাকতে হবে।

আমরা আশা করি, আগামীতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল বৈষম্য, বঞ্চনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনার বিজয় ঘোষিত হোক।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

জয়ন্ত কুমার দেব

সাধারণ সম্পাদক
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

সাধারণ সম্পাদকের নিবেদন

প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সেতুবন্ধন গড়ে উঠুক–এই আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ আবহমান বাঙালির। বাঙালি সংস্কৃতিরও। কৃষিকেন্দ্রিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মার সংযোগ স্থাপন এবং সকল অশুভ রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিলাভ–বাঙালি সনাতনধর্মী যাবতীয় পূজাপার্বণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র উৎসবের পথ ধরে এ পুজো উদযাপিত হয় না। প্রতিদিন মানুষ জীবনবিকাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করবে; স্বাধীনতা, মুক্ত ও বৈষম্যহীন ইতিবাচক চিন্তা, মানবিকতা, গণতন্ত্রের রক্তসূর্যকে নবীনভোরে প্রণাম জানাবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর সকল প্রান্তের, সকল অঞ্চলের দুশ্চিন্তাহীন মানুষেরা উর্বর মাটি ও মানুষের সঙ্গীত গাইবে। তাদের ভেতরকার পুরনো শুদ্ধ ও নোতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারাবিশ্বের বিষ-অন্ধকার তাড়িয়ে দেবে।

বাঙালির সব পুজোপার্বণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় পরিপূর্ণ। এ উৎসবে ফসল উৎপাদনের যোগসূত্র রয়েছে। এখানে উর্বরতার কামনা আছে। শস্যশ্যামলা ফসলের প্রার্থনা আছে। তারা আছে উৎকৃষ্ট উৎপাদনে, শ্রম ও ঘামে; তাদের কাছে পূজোপার্বণ সারাবিশ্বের সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে। সংকটে, সংঘর্ষে, মানবিক বিপর্যয়ে মানুষের কান্না তারা শুনতে পায়। সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। আজ এই সময়ে সারা পৃথিবীতে যখন কর্তৃত্ববাদ, 'ফ্যাসিজম' নামে এক নোতুন শাসন ব্যবস্থা চালু করার আয়োজন চলছে, তখন বিশ্বব্যবস্থাপনা নিয়ে নোতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে বৈকি! গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে, সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রে পচন শুরু হয়েছে। একমাত্র 'মানবতাবাদ'ই পারে সবধরনের সমস্যা উত্তরণে সঠিক ভূমিকা রাখতে।

সব অশুভ শক্তিকে রুখে দিয়ে এক বৈষম্যবিরোধী কল্যাণ সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা বিনির্মাণ করতে চাই।

নিজের কালের জ্ঞান ও অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে শ্বাশত সুন্দরকে প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক সত্যকে আবিষ্কার করে নিতে চাই। এই চাওয়া ও পাওয়ার সঙ্গে মেলবন্ধ ঘটাতে আমরা পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন দেবদেবীর আবাহন করি। তাঁদের কাছে শক্তি চাই, শান্তি চাই। এ শক্তি ধ্বংসাত্মক নয়, সৃষ্টিশীল; নব নব অভিযোজনার।

শারদপ্রাতের এ শুভ মুহূর্তে বিশ্বের সকল মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি বয়ে আসুক, পৃথিবী বাসযোগ্য বয়ে উঠুক। দূর হোক ক্লান্তি, সব অন্ধকার, অশুভ চেতনা ভেঙেচুরে নির্মূল হোক, নির্মল হোক।

ড. তাপস চন্দ্র পাল

সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শুভেচ্ছা

আমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা। প্রকৃতিতে শরৎকাল জেনো দুর্গাদেবীর আরাধনার জন্য আপন মহিমায় সেজে উঠে। আমরাও মায়ের আগমনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠি। প্রতি বছরের মতোই এবারও আমরা নানা প্রতিকুলতা অতিক্রম করে তেজগাঁও সমাজ উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ হতে শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজনে ব্রতী হয়েছি।

শ্রী শ্রী দুর্গামায়ের পুজো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙালির মহা উৎসব। এ জন্যই শারদীয়া দুর্গোৎসব কে সর্বজনীন উৎসব বলা হয়। চিরায়ত দুর্গাদবীর বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ ঘটানো। ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক না কেন মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, কল্যাণ চিন্তা জাগ্রত করে হিংসা, দ্বেষ, অহংকার, দুর্নীতি, হানাহানি অবসানের অন্তর্নিহিত লক্ষ্যে আমরা সর্বজনীন দুর্গাপূজা পালন করে থাকি।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সকল সদস্য, আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকল উপ-কমিটির সদস্য, ভক্ত বৃন্দ, স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ, উপদেষ্টাগণ, পৃষ্ঠপোষকতাকারী যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাহায্য সহযোগিতায় এই দুর্গাপূজা উৎসব মুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয় তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ সরকার এ বছর নির্বিঘ্নে দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, অন্যান্য বিষয়েও সুযোগ সুবিধা সাহায্য সম্প্রসারিত করেছেন। এ জন্য সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ জানাই।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শারদ সংকলন 'অপরাজিতা' র নবম সংখ্যা প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই। এই প্রকাশনার সাথে যারা সরাসরি যুক্ত তাদের সাফল্য কামনা করছি এবং তাদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি আশা করছি এবং শ্রী শ্রী দুর্গামায়ের কাছে প্রার্থনা করি, সকল আসুরিক শক্তির বিনাশ করে, হিংসা হানাহানি বন্ধ করে আমরা যেন সকলে মিলেমিশে আনন্দের সঙ্গে ও নিরাপদে দুর্গাপুজো উৎযাপন করতে পারি।

সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

নিতাই চন্দ্র সাহা

সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শুভেচ্ছা

প্রতিবছর আশ্বিন মাসের কাশফুলে ভরে ওঠা প্রকৃতির মাঝে যখন ঢাকের বাদ্যি, কাঁসরের ধ্বনি আর উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে আমাদের চারপাশ, তখনই আমরা উপলব্ধি করি মা দুর্গার আগমন আসন্ন। দুর্গাপূজা শুধুই একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। এটি আমাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, চিরন্তন ঐতিহ্য ও মিলনের প্রতীক।

মা দুর্গা কেবল একজন দেবী নন, তিনি শক্তির উৎস, মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অবিচল বার্তা। অসুরের বিরুদ্ধে তার বিজয় আমাদের শিক্ষা দেয়–সত্য, সাহস ও সৎ পথে অবিচল থাকলেই অন্ধকার দূর হয়, বিজয় হয় শুভবোধের।

এই উৎসব আমাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে আমরা একত্রিত হই আনন্দে, পুজো মণ্ডপে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং একসাথে প্রার্থনায়–একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের আশায়।

বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতা, অশান্তি ও বিভেদের মাঝে দুর্গাপূজা যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়–সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সত্যের চর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মা দুর্গা যেন আমাদের অন্তরকে শক্তি ও সহমর্মিতার আলোয় উদ্ভাসিত করেন।

এই শারদীয় উৎসবে আসুন আমরা সকল হিংসা, হানাহানি ভুলে গিয়ে এগিয়ে যাই ঐক্যের পথে, আলোর পথে।

আপনাদের সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অফুরন্ত শুভকামনা। মা দুর্গা আপনাদের জীবন ভরে দিন সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যে।

শুভ দুর্গাপূজা।

জয় মা দুর্গা

প্রকৌশলী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

জয় মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী

শুভ্র শীতল কাশের শোভায় আগমনী বার্তা বয়ে বাজছে ঢাকের সুর।

ঢাকের মন্ত্রমুগ্ধ আওয়াজ আর একবার আমাদের জানিয়ে দেয় মা আসছে। সমস্ত আসুরিক শক্তিকে কাটিয়ে সকলের জীবনে সমৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক সাফল্য আনুক।

মায়ের আগমনের সাথে সাথে বিনাশ হোক সকল অশুভ শক্তির আলোয় আলোয় আলোকিত হোক ধরণী।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

প্রদীপ কুমার সাহা

রথীন্দ্র নাথ দত্ত

কানাই লাল বণিক

অলোক বসু

বিপ্লব কুমার রায়

সঞ্জয় চ্যাটার্জী

বিমল কুমার সাহা

বিপুল কুমার বিশ্বাস

স্বাগতম কুমার সাহা

প্রদীপ কুমার সূত্রধর

ডাঃ মৌসুমী সরকার

অধ্যাপক আরতি দাশ

প্রকৌশলী সঞ্জিত কুমার ঘোষ

রমেশ চন্দ্র ঘোষ

তাপস কুমার সাহা

ডাঃ সুশংকর কুমার মন্ডল

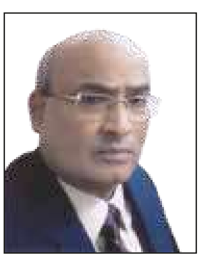
প্রফেসর স্বপন কুমার বনিক

জীবন কৃষ্ণ মোদক

অরুণাভ চক্রবর্তী

নিতাই চন্দ্র মণ্ডল

প্রণয় কান্তি বিশ্বাস

ড. রতন চন্দ্র দে

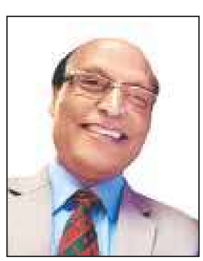
প্রণব কুমার সাহা

চন্দন কুমার দে

শশাঙ্ক শেখর ভৌমিক

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

গৌতম কুমার ঘোষ

আনন্দ মোহন মন্ডল

বাবুল চন্দ্র রায়

অমলেন্দু রায়

সুজিত চ্যাটার্জী

সুবল চন্দ্র রায়

সপ্তম বিশ্বাস, এফসিএ

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন

প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার

অনুপ কুমার সাহা

গোপাল চন্দ্র দেবনাথ, এফসিএ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বিষ্ণুপদ রায়, এফসিএমএ

ডাঃ চন্দ্র শেখর বোস

সঞ্জীব কুমার বণিক

প্রণব পাল

প্রকৌশলী চিনময় কান্তি গোলদার

চন্দন কুমার সাহা

মধু সূদন মন্ডল

নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

বিশ্বজিৎ কুমার কর্মকার

অখিল বিশ্বাস

রাজিব দাশ

ইঞ্জি. মিহির কান্তি মজুমদার

ডাঃ দেবব্রত হালদার

অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল

অনুপম রায়

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

নিতাই চন্দ্র সাহা
সভাপতি

সঞ্জীব কুমার সাহা
সহ-সভাপতি

খোকন কান্তি শর্মা
সহ-সভাপতি

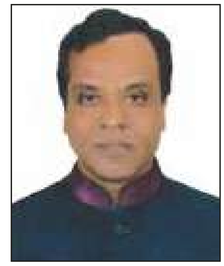
অরুন চন্দ্র ভৌমিক
সহ-সভাপতি

দীপক লাল কর্মকার
সহ-সভাপতি

বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সহ-সভাপতি

শিশির রঞ্জন দাস
সহ-সভাপতি

ভবেশ গোস্বামী
সহ-সভাপতি

ডাঃ রণধীর কুমার কুন্ড
সহ-সভাপতি

প্রকৌশলী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

অশোক ধর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

নিহার বিশ্বাস
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

ঝন্টু চন্দ্র সাহা
অর্থ সম্পাদক

নারায়ণ চন্দ্র দে
সহ-অর্থ সম্পাদক

ইঞ্জি. উত্তম কুমার দাস
সাংগঠনিক সম্পাদক

শ্যামল মিত্র
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

বিশ্বজিত রায়
দপ্তর সম্পাদক

সঞ্জীব মৈত্র
প্রচার সম্পাদক

যদুনাথ ঘোষ
সহ-প্রচার সম্পাদক

এ্যড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার
আইন বিষয়ক সম্পাদক

অপূর্ব কুমার রাহুত
গণ সংযোগ সম্পাদক

প্রকাশ কুমার দাস
গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় রায় তপন
সহ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

অরুন চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

সবিতা দাস ঐশী
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

প্রদীপ কুমার সাহা
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

কেসব সেন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

বাবুল চন্দ্র ঘোষ
ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক

কবিতা রানী পাল
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

কাকুলী নাগ
সহ-মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

অসীম কুমার দাশ
ছাত্র, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক

দিপ্তী রানী সাহা
পূজা বিষয়ক সম্পাদক

মিনা ভৌমিক
সহ-পূজা বিষয়ক সম্পাদক

সঞ্জয় কুমার দাস
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

অসীম কুমার দে
সদস্য

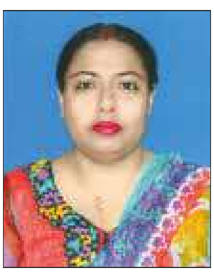

সুবর্ণা দাস
সদস্য

সুপ্রিয়া রানী সাহা
সদস্য

রতন কুমার রায়
সদস্য

গৌরী কর্মকার
সদস্য

দুলাল দেবনাথ
সদস্য

বকুল রানী দেবী
সদস্য

টুম্পা দাস
সদস্য

নিমাই চন্দ্র দাস
সদস্য

প্রনব কুমার রায়
সদস্য

প্রদীপ কুমার পাল
সদস্য

সুজন দে
সদস্য

সুদীপ কুমার ভদ্র
সদস্য

মৌসুমী রায়
সদস্য

পরিমল চন্দ্র পাল
সদস্য

জয়ন্তী রাণী ধর
সদস্য

আরতী বসাক
সদস্য

SMART App
Bank Asia
ব্যাংক এশিয়া
স্মার্ট ব্যাংকিং অ্যাপ
সবসময়
সবখানে
২৪/৭
স্মার্ট ব্যাংকিং
ডাউনলোড করতে
স্ক্যান করুন
24/7 SERVICE
16205

WORLD'S BEST
AirAsia
Happy
DURGA PUJA
DHAKA - KUALA LUMPUR - BANGKOK - SINGAPORE - HONG KONG - JAKARTA - YOGYAKARTA
SURABAYA - BALI - BRUNEI - PHNOM PENH - HO CHI MINH - MANILA - HANOI
CALL TO ENQUIRE
+88 01984 555 888
+88 09678 742 752
TAS group

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র

শুভ
মহালয়া

ওঁম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়
পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের
আবির্ভাব উপলক্ষে-
জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রা
শ্রী শ্রী কৃষ্ণ পূজা: রাত ৮টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ।

শুভ
মহালয়া

শুভ
মহালয়া

"আসন্ন দূর্গাপুজা উপলক্ষে-হিন্দু সম্প্রদায়
ভাই-বোনদের সাথে মত
প্রধান অতিথি: জনাব সাইফুল
নিরব
সাবেক আহবায়ক, ঢাকা
আয়োজনেঃ জাতীয়তাবাদী

শুভ
মহালয়া

CAT
CATERPILLAR

শারদীয় দুর্গাপূজা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার

‘দুর্গ’ (দুর্-√গম্+ড) শব্দের সঙ্গে টাপ্ প্রত্যয়যোগে ‘দুর্গা’ (দুর্গ+স্ত্রিয়াং টাপ্) শব্দটি গঠিত হয়েছে। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ অনুসারে দুর্গ (বা দুর্গম) নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই দুর্গা (দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা)। দুর্গম অসুরকে বধ করে জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা (দুর্গতিনাশিনী) বলা হয়। দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। সকল প্রকার বিপদ থেকে যিনি জীবকে রক্ষা করেন, জগতের কল্যাণ সাধন করেন এবং মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, তিনিই হচ্ছেন দেবী দুর্গা। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে ও বিশেষণে অভিহিত হন। পুরাণে কথিত আছে যে, আদ্যাশক্তি মহামায়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের লক্ষ্যে এবং সমগ্রজীবের কল্যাণার্থে যুগে যুগে ও কালে কালে বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে আবির্ভূত হয়েছেন। দেবী দুর্গা তাঁরই বিশেষ সময়ের, বিশেষ যুগের এক বিশেষরূপ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে প্রাচীনকালে ব্রহ্মার বরে পুরুষের দ্বারা অবধ্য মহিষাসুর দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ মহিষাসুরকে হত্যা করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে বিষ্ণু (নারায়ণ) এবং শিবের সমীপে উপস্থিত হন। মহিষাসুরের কাহিনি শুনে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করে। প্রথমে বিষ্ণুর ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে এক মহাতেজ নির্গত হয়। দেবরাজ ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতার দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হয়। বিরাট পর্বতসম ও উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ একত্রিত ও ঘনীভূত হয়ে অগ্নিবর্ণা, মহাতেজস্বিনী, পরমরূপবতী এক দেবীমূর্তি ধারণ করে। দেবগণের সম্মিলিত শক্তির সংহত বা মিলিতরূপ থেকে আবির্ভূত মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী হলেন দুর্গা। সমুদ্র ও বিশ্বকর্মা দেবীকে বহুরকম অলংকার দান করেন। দেবগণও বিভিন্ন প্রকার অলংকার দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করেন। তারপর দেবগণ প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্র দেবীকে দান করেন। হিমালয় দেবীকে বাহন হিসেবে সিংহকে দান করেন। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত এই অষ্টাদশভুজা (তবে বাঙালিরা দেবীকে দশভুজারূপে পূজা করেন। তবে শাস্ত্রানুসারে দুর্গার বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোল, আঠারো বা কুড়ি) দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবী দুর্গাকর্তৃক দুরাত্মা মহিষাসুর নিধন বর্তমানে প্রচলিত দুর্গাপূজার দৃশ্যপট।

শরতের আকাশে সাদা কাশফুল দোলে উঠলেই বাঙালি হৃদয় এক অদ্ভুত আবেগে ভরে ওঠে। কেননা শরৎকালেই অনুষ্ঠিত হয় হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা শারদীয় দুর্গাপূজা নামে অভিহিত। আর বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তীপূজা নামে অভিহিত। বাসন্তীপূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গাপূজাই আবহমান কাল থেকে মহাসমারোহে উৎসবাকারে পালিত হচ্ছে। শারদীয় দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বাসন্তীপূজা মূলত কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আশ্বিন বা কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে) শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি তিথি যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যার নাম মহালয়া।

ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। দুর্গাপূজা বসন্তকালের উৎসব হলেও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অকালে অর্থাৎ বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজার আয়োজন করেন বলে শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বা অকালপূজা বলা হয়। শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত এই ছয়মাসকে বলা হয় দক্ষিণায়ন এবং মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এই ছয়মাসকে বলা হয় উত্তরায়ণ। অতএব শরৎকাল হলো দেবতাদের দক্ষিণায়ন (রাত্রিকাল)। শরৎকাল দেবতাদের পূজার যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে এই পূজার নাম অকালবোধন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজাহা, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, জন্মাষ্টমী, শারদীয় দুর্গোৎসব, বৌদ্ধপূর্ণিমা, বড়োদিন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কোনো বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয় প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব। জাতীয় চেতনায় এবং শান্তি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে সামনে রেখে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল গোষ্ঠীর মানুষ সাড়ম্বরে পালন করে প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব।

শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সমগ্র বাঙালির কাছে এ পূজা চিরায়ত ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক অনুপম প্রীতিময় আনন্দ

উৎসব। বাংলা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে যে কয়েকটি উৎসব সর্বজনীন মর্যাদা পেয়েছে, শারদীয় দুর্গাপূজা তার মধ্যে অন্যতম। দুর্গাপূজা কেবল হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি বাঙালি সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের উৎসব। এখানে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের সীমানা বিলীন হয়ে যায়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিখ– সবাই সমানভাবে অংশ নেন। তাই একে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব বলা যায়। অশুভ ও অপশক্তির পরাজয় এবং শুভশক্তির জয়, সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় সর্বজীবের মঙ্গল সাধন শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অশুভ ও আসুরিক শক্তি দমনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, সকল মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ, মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য বা ভেদাভেদ ও অন্যায়, অবিচার দূরীকরণ এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমাজগঠন করার শিক্ষালাভই দুর্গোৎসবের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শারদীয় দুর্গোৎসব সমাজকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র বাঙালিকে। এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে সমস্ত বাঙালিকে। উদ্বুদ্ধ করে ভ্রাতৃবোধ ও সম্প্রীতি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে। সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে। দুর্গোৎসবের শুভ্র ও আনন্দ জাগানিয়া পরশ শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দু ধর্মানুসারীদেরই নয়, এর চিরায়ত ঐকতান স্পর্শ করে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়কে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে অনাবিল আনন্দ সবার মনের মাঝে জেগে ওঠে তা বাঙালির প্রতিটি গৃহকে আলোকিত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়।

সকল ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা, সমগ্র জীবের কল্যাণ সাধনই ধর্মের মূল লক্ষ্য, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন নয়। এই চেতনাকে মনে-প্রাণে ধারণ করেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি কামনায় এবং সর্বজীবের মঙ্গলার্থে আবহমান কাল ধরে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালন করে শারদীয় দুর্গোৎসব, আরাধনা করে দেবী দুর্গার। উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে সকল প্রকার হীনতা, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই চেতনাকে ধারণ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করে এবং আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। সকল বাঙালি মিলিত হয় অভিন্ন মোহনায়, অভিন্ন চেতনায়। পূজার ধর্মীয় অংশটুকু হিন্দুদের; কিন্তু মেলা, উৎসব ও আপ্যায়নে অংশগ্রহণ এবং আনন্দ উপভোগ করেন সবাই। সকলের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে শারদীয় দুর্গাপূজা পরিণত হয় সর্বজনীন উৎসবে, পরিণত হয় সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায়, পরিণত হয় অন্যতম জাতীয় উৎসবে। ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে এ উৎসব পরিণত হয় সম্প্রীতিময় আনন্দযজ্ঞে। সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আবহ এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় সকল মানুষের হৃদয়; দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। পূজা থেকে উৎসবে রূপান্তরের এই যে প্রক্রিয়া, এটি বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক সত্তার চিরন্তন বহিঃপ্রকাশ।

অতীতকাল থেকেই দুর্গাপূজা উৎসবাকারে পালিত হয়ে আসছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে। সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়, এমন বৃহত্তম আয়োজন খুবই গুরুত্ব বহন করে। পূজার সময় মন্দিরে মন্দিরে ভক্তিমূলক গান, চণ্ডীপাঠ, অর্চনা, আরতি, ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং সেই সাথে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ, মেলা ইত্যাদি দুর্গোৎসবকে ধর্মীয় আবেশে আনন্দঘন করে তোলে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব এটা শুধু কথার কথা নয় - পূজা বিধিতেও তা লক্ষ করা যায়। দেবী দুর্গা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় সপরিবারে পূজ্যপাদ। দুর্গার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মহাবীর দেবসেনা কার্তিক, ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজিত হন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্থান থাকে সবার উপরে। দুর্গা দেবীর সঙ্গে তাঁর বাহন সিংহ, গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হংস, এমন কি মহিষাসুরও পূজিত হন। উঁচু-নীচু-স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলে একত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। পূজার পর শুভ বিজয়া। বিজয়ায় অবাধ মিলন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ একত্রে বিজয়ার উৎসব পালন করে। সকল বাধা ও মনের সংকীর্ণতা দূর করে অনৈক্য-বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূরে ঠেলে মানুষে মানুষে সমাবেশ ঘটে পূজার উৎসবস্থলে। সকলের সহাবস্থান আর ঐক্যের মেলায় পরিণত হয় পূজার মন্দির। প্রকাশিত হয় বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এ জন্যই শারদীয় দুর্গাপূজা সামাজিক সম্প্রীতি, মহামিলন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার চিরন্তন উৎসব। সম্প্রীতিবিধ্বংসী কোনো প্রচেষ্টা দুর্গাপূজার সর্বজনীনতাকে বিনষ্ট করতে পারবে না। বাঙালি জাতিসত্তার মর্মমূলে গ্রথিত ঐকতানের কাছে তা পরাভূত হবেই। আপামর জনতা দুর্গোৎসবে সামিল হয়ে উৎসবের আমেজে যে ঐক্যচেতনায় বাধা পড়েছে তা ছিন্ন করার ক্ষমতা কারোর নেই। কোনো ঠুনকো আঘাতে এ বন্ধন কোনো দিন ছিন্ন হবে না।

দুর্গাপূজা যদিও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিন্দুদের, কিন্তু মূলবাণী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা দুর্গোৎসবে সকল

ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক সামাজিক বন্ধন ও অসাম্প্রদায়িক পরিচয় ফুটে ওঠে, ভ্রাতৃত্ববোধের এক নতুন আবহ তৈরি হয়। দেবীর যুদ্ধরতরূপ লোকশিক্ষার একটি দৃষ্টান্ত। এটি হচ্ছে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির যুদ্ধ, অন্যায়, অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়, সত্য ও সদাচারের সংগ্রাম। দেবীর বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ। দুর্গাপূজা হচ্ছে শক্তি অথবা ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনা। দেবীর 'দশ হাত' ঐক্য বা সম্মিলিত শক্তির প্রতীক। ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, অন্যায়কে প্রতিহত করার শিক্ষাই দেবীর প্রতিমা হতে শিক্ষণীয়। সুতরাং দুর্গাপূজা শক্তি, সংহতি বা ঐক্যের প্রতীক।

সমাজপ্রগতির নানান অনুষঙ্গের মধ্যে ধর্ম কিংবা ধর্মীয় আচার অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ধর্মীয় আচার যখন কোনো একটা জাতির জীবনে উৎসবের মর্যাদা প্রাপ্ত হয় তখন তা ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে অগ্রবর্তী সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলের চলমান সোপান। বাঙালির জীবনে শারদীয় দুর্গোৎসব তেমনি এক বহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনসত্তার প্রতিরূপ। যেখানে থাকে না কোনো জাত-পাতের বাছ-বিচার, থাকে না কোনো ভেদাভেদ, থাকে না সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। বাঙালি যে অসাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তা প্রতিবছরই প্রমাণিত হয় দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে।

শারদীয় দুর্গাপূজা বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি ধর্মীয় পূজা হলেও তার সীমা অতিক্রম করে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এখানে ভক্তি ও আনন্দ, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, শিল্প ও অর্থনীতি সব একসূত্রে গাঁথা। এই উৎসব আমাদের শিখিয়ে দেয়, একতা ও সহমর্মিতাই সমাজের সর্বোচ্চ শক্তি। তাই একে যথার্থই বলা যায়– শারদীয় দুর্গাপূজা হচ্ছে সম্প্রীতির আর বাঙালির আনন্দ উচ্ছ্বাস উদ্‌যাপনের এক মহামিলনধর্মী সত্যিকারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব।

লেখক : অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ; সাবেক প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল; সাবেক উপদেষ্টা, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র;

সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দুর্গাপূজা, প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং নবপত্রিকা

অধ্যাপক ড. সুধাংশু শেখর রায়

'Self-preservation is the first law of nature'-S. Butler.'

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজায় শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে আমরা বহু স্তোত্রপাঠ শুনে থাকি। একেকটি স্তোত্র একেকটি অর্থকে বহন করে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে পূজাপাঠে শান্তি ও কল্যাণের কথাই বেশি করে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু একটি স্তোত্র জগতের অবিনাশী রূপটিকে প্রচন্ডভাবে তুলে ধরে। সেটি হচ্ছে- 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোহ নম'। অর্থাৎ বিশ্বচরাচরে দেবীকে শক্তিরূপে বিবেচনা করে তাঁর প্রতি আমাদের সমীহ প্রণাম জানাই। এটির সঙ্গে বিশ্বের প্রকৃতি ও পরিবেশের যে অবিনাশী সংযোগ এবং তার থেকে আমাদের বেঁচে থাকার যে রসদ, সহায় ও প্রেরণা পাই তাকেই এতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

রসায়নশাস্ত্রে আমরা শক্তির অবিনাশী তত্ত্বের কথা জানতে পাই। পৃথিবীর যে ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি রয়েছে তাকে যদি আমরা আমাদের নির্বিচার ও অকল্যাণকর স্বার্থে ব্যবহার করি তবে সেই শক্তি রুদ্ররূপ ধারণ করে আমাদের বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ নেয়। ভূমিকম্প, সুনামী, এল-নিনো, লা-নিনা, ডেঙ্গু, করোনা প্রভৃতি হচ্ছে তার একেকটি দৃশ্যমান লক্ষণ। আমরা নির্বিচারে বনজঙ্গল উজাড় করছি, আগুন ও জ্বালানীর বেপথে ব্যবহার করে ভূমণ্ডলে কার্বন জাতীয় গ্যাস আরো ব্যাপক হারে উৎপন্ন করে পরিবেশে উষ্ণতা বাড়িয়ে বিভিন্ন দুর্যোগ ডেকে আনছি। পরিবেশের পতনের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের চলতি অভিশাপ হচ্ছে মহামারিরূপে করোনা ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব। এ সবই হচ্ছে সেই শক্তিরূপী দেবতাকে অশ্রদ্ধার পরিণাম।

মূলত শাক্তরা শক্তির পূজা করে থাকলেও আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী বসবাসরত সনাতনধর্মীরা মূলত বৈষ্ণববাদী, স্বভাবতই তারা মূলত নিরামিষভোজী। বাংলাদেশ ও ভারতের পূর্বাঞ্চল বাদে প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের মানুষেরা নিরামিষান্ন ভক্ষণ করে থাকেন। বাংলাভাষী হিন্দুরাও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সবুজের দানকে খাবারের অংশে পরিণত করেছেন বহুবর্ষ আগে থেকেই। নিরামিষ বললে মনে হয়, মানুষ এগুলো খেলে শৌর্যবীর্য ও বলহীন হয়ে পড়ে। যদি তাই হতো তাহলে রাজপুত, মারাঠা, শিখ কিংবা তামিল জাতিগোষ্ঠীর চেহারা এত সুন্দর, শক্ত-সমর্থ থাকতো না এবং ভিন্নদেশী উপনিবেশীদের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাড়ানোর কথাও ইতিহাসে লেখা হতো না। অসাধারণ মাথার মানুষ ভারতীয় বিজ্ঞানী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি আবুল কালামও ছিলেন নিরামিষাশী। নিরামিষান্ন ভোজনে শরীর নিরোগ থাকে, জ্যোতির্ময় হয়, মানুষ চিন্তা ও কৌশলে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, অহিংসার চেতনায় আরো বেশি উজ্জীবিত হয়। নিরামিষান্নের গুণ ও উপযোগিতা এখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রকটিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জগজ্জুড়ে পরিবেশের পতন ও হিংসা, হানাহানির পেছনে মাত্রা ছাড়ানো আমীষ ভক্ষণও যে অনেকাংশে দায়ী তা ২০০৬ সালে কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের সময়ে নিরামিষান্ন ভক্ষণের উপযোগিতা নিয়ে কথা উঠেছিল।

কোপেনহেগেনে জলবায়ু সম্মেলনকে সামনে রেখে '২০০৬ ঝঃবৎহ জবারবড়িহ ঃযব ঈড়ধংঃ ড়ভ এঃধপশষরহম এষড়নধষ ডধৎসরহম' শীর্ষক লেখার প্রণেতা লর্ড স্টার্ন ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী পত্রিকা 'এঃযব এঃরসবং'এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তার বিশ্বভাবনা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, বিশ্বকে যদি জলবায়ু পরিবর্তনকে রুখতে হয় তাহলে মানুষকে প্রাণীমাংস আহার কমিয়ে দিয়ে নিরামিষে মনোযোগী হতে হবে। তিনি লাগসই যুক্তি দিয়ে বলেন, মাংসের খাবার তৈরিতে জলের অনাহুত ও বাড়তি ব্যবহার হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ গ্রীনহাউস গ্যাস উৎপন্ন হয়; আর তা পরিবেশকে ক্ষতিকর পর্যায়ে উষ্ণ করে তোলে। এটি, তাঁর ভাষায়, বিশ্বের সম্পদের ওপর বিশাল একটি চাপ তৈরি করছে। তিনি বলেন, গবাদিপশু ও শূকর থেকে সরাসরি যে পরিমাণ মিথেন (গ্যাস) আসে তা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে উৎপাদিত গ্রীনহাউস গ্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। তিনি বলেন, উষ্ণ পরিমণ্ডল তৈরির জন্য দায়ী গ্যাস হিসেবে মিথেন কার্বন-ডাই-অক্সইডের থেকে ২৩ গুণ বেশি শক্তিশালী। অতএব খাবারের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে, পরিবেশ ও তার শক্তিকে ঠিক রাখার জন্য। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মাত্রাছাড়া মাংস ভক্ষণ মানুষকে ক্রোধান্বিত করে তোলে; অতএব শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিমণ্ডল ও অটুট পরিবেশ বজায় রক্ষার স্বার্থে প্রকৃতির দেয়া খাবারে আমাদের আরো বেশি করে মনোযোগী হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা হচ্ছে সকল পূজার পূজা। এই পূজায় খালি দুর্গাই পূজা পায় না, পূজা পায় গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী এমনকি ওই অসুরও। শিল্পকলায় যেমন 'কবিতা সঙ্গীত, নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রণ' প্রভৃতিকে বলা হয় শিল্পকলার প্রথম ছয় শিল্প। কিন্তু এগুলার সবকটির মিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরী হয় চলচ্চিত্র-দুর্গাপূজার সঙ্গে তুলনায় এনে চলচ্চিত্রকে বলা যায় এক সর্বংসহা শিল্প। দুর্গাপূজা হচ্ছে তেমন একটি সর্বংসহা পূজা যেখানে সবাই পূজা পায়, সবাইকে সমাজের একেকটি অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি বারবণিতাদের বসতবাড়ির মাটিও লাগে দুর্গার মূর্তি নির্মাণে। কেন? কারণ দুষ্কর্মী অসুর কিংবা অবহেলায় নিপতিত

বারবণিতাও সমাজেরই একটি অংশ, তাদের আমরা অনাদরে ফেলে দিতে পারি না। এখানেই দুর্গার মাহাত্ম যে সে সবাইকেই ধারণ করে, ফেলে দেয়না। পরিবারের একটি ছেলে বা মেয়ে পথভ্রষ্ট হলেও সর্বংসহা মা যেমন তাকে পরিত্যাগ করে না, তেমনি দুর্গা হচ্ছে সকলকে ধারণ করার মহাশক্তি।

দুর্গাপূজার অন্য অনেক অনুষঙ্গের মাঝে নবপত্রিকা হচ্ছে তেমনি একটি অনুষঙ্গ যার সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশ সরাসরি যুক্ত। নবপত্রিকার সরাসরি মানে হচ্ছে নয়টি পাতা। দুর্গাপূজার সময় মণ্ডপ প্রাঙ্গণে নবপত্রিকা স্থাপন ও তার পূজা হচ্ছে বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের দুর্গোৎসবের একটি রীতি বা আচমন। নবপত্রিকা প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে নয়টি গাছের সম্মিলন যা নয়টি দেবীর প্রতীক। নয়টি গাছ নয়টি দেবীর প্রতীক হলেও সেই গাছগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য অংশ যা আমাদের খাবার জোগায়, ঔষধি জোগায়; তাদের আমরা যে ধ্বংস করতে পারি না তা জানান দিতেই নয়টি দেবীর প্রতীকে রূপান্তরিত করে তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, পূজা করি। প্রকৃতপক্ষে নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়েই দুর্গাপূজার শুরু। অর্থাৎ প্রকৃতি ও তার মহাশক্তির পূজা। এই নবপত্রিকার নয়টি গাছ মিলিয়ে আমরা গণেশের পাশে একটি বৌ সাজাই, যার প্রচলিত নাম হচ্ছে কলাবৌ। কিন্তু এই কলাবৌ প্রকৃতপক্ষে নয়টি গাছের সম্মিলন। এই নয়টি গাছ হচ্ছে:

১. কলা গাছ। কলাগাছ হচ্ছে দেবী ব্রাহ্মণীর প্রতীক।
২. কচু গাছ। কচুগাছ হচ্ছে দেবী কালিকার প্রতীক।
৩. হলুদ গাছ। হলুদগাছ হচ্ছে স্বয়ং দেবী দুর্গার বা উমার প্রতীক।
৪. জয়ন্তী গাছ। জয়ন্তী গাছ হচ্ছে দেবী কার্তিকীর প্রতীক।
৫. বেল গাছ। বেল গাছ হচ্ছে দেবী শিবানীর প্রতীক।
৬. ডালিম গাছ। ডালিম গাছ হচ্ছে দেবী রক্তদন্তিকার প্রতীক।
৭. অশোক গাছ। অশোক গাছ হচ্ছে দেবী শোকরহিতার প্রতীক।
৮. ধান গাছ। ধান গাছ হচ্ছে দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক এবং
৯. মানকচু গাছ। মানকচু গাছ হচ্ছে দেবী চামুন্ডার প্রতীক।

এই নয়টি গাছ এবং সেগুলোর সঙ্গে নয়জন দেবীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে পরিবেশ ও তার অবারিত দানের সঙ্গে আমাদের জীবনযাপনের একটি গভীর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। কলাগাছ হচ্ছে এমন একটি গাছ যে তার প্রতিটি অংশই আমাদের কাজে লাগে। কলায় যেমন লৌহজাত উপাদান, পটাশিয়াম ও শর্করা ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপাদান আছে যা আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। কলাগাছের মোচা ও ভেতরের অংশ, যাকে স্থানীয় ভাষায় ভাদাইল অথবা ভাড়ালি বলা হয়, আমাদের পাকাশয়ের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও শক্তিবর্ধক। কলা শ্রীবর্ধক ও দীর্ঘআয়ু প্রদায়ী। কলাগাছের প্রতীক দেবী ব্রাহ্মণীর অন্তর্নিহিত রূপটি বৈষ্ণবভাবকে উপস্থাপিত করে। কলাগাছের খুব কাছাকাছিই হচ্ছে সাধারণ কচু গাছ অথবা মানকচু। এ দুটির সঙ্গে দেবী কালিকা ও দেবী চামুন্ডার স্বরূপ চিন্তা করা হয়েছে। এ দু'দেবীই হচ্ছেন কালির দুটি শক্তির প্রতীক। এ দু'দেবীই যেমন রক্ত ঝরান আবার রক্ত ধারণও করেন। অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দেবী কালিকা যেমন রক্ত ঝরাচ্ছেন, আবার অশুভ রক্তের বিস্তৃতি না ঘটিয়ে তা ধারণ করছেন দেবী চামুন্ডা। কচু থেকেও আমরা রক্তের প্রচুর উপাদান পাই, আবার কেটে গেলে রক্তবন্ধের জন্য কচুর রসের তুলনা নেই। গ্রামীন জীবনে মানুষ এখনও রক্তপাত বন্ধে কচুর রস ব্যবহার করছে। এ হচ্ছে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।

হলুদের প্রতীক দেবী স্বয়ং দুর্গা বা উমা। আমাদের খাবারে হলুদ হচ্ছে সকাল বিকেলের অনুষঙ্গ। হলুদ হচ্ছে জীবানুনাশক ও জীবানু প্রতিরোধক উপাদান। হলুদে সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সকল প্রকার মাঙ্গলিক ও সামাজিক কাজেই হলুদের ব্যবহার। বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই বিয়ের সময় হলুদ অপরিহার্য অনুষঙ্গ। হলুদ উৎসব ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

জয়ন্তী গাছের প্রতীক হচ্ছে দেবী কার্তিকী। এই দেবী কার্তিকী নিজেই হচ্ছে দেবী দুর্গা। অন্যদিকে মহাদেবী পুত্র কার্তিক একজন বীরযোদ্ধা এবং যুদ্ধে রক্তপাতের আশংকা থাকে। জয়ন্তী গাছের ভেষজ গুণ রক্তপাত বিনাশী। জয়ন্তী হলুদেরই আরেকটি প্রজাতি।

বেল গাছের প্রতীক দেবী শিবানী। প্রকৃতপক্ষে শিবেরই একটি অংশ সে। বেল পাতার তিনটি অংশ। এই তিনটি অংশ ব্রক্ষা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমন্বীত রূপ। বেল আমাদের যকৃত ও পাকস্থলির জন্য খুবই উপকারী। বেলপাতা খালি পূজায় লাগে তা নয়। এ পাতা ঔষধি হিসেবেও কাজ করে। বাড়ির সামনে বেল গাছ একটি সুস্বাস্থ্য প্রদায়ী পরিবেশ দান করে থাকে। ডালিম গাছের প্রতিভূ হচ্ছেন দেবী রক্তদন্তিকা। এ নাম থেকেই ডালিমের অন্তর্নিহিত উপযোগিতাটি পাই। ডালিম খেলে দন্ত রক্তবর্ণহয়ে উঠে। তার থেকেও বড় কথা ডালিমও শরীরে রক্ত বাড়ায়। রক্তশূন্যের রোগীদের ডালিম দ্রুত রক্ত বাড়িয়ে দেয়। গ্রামীন বাংলার মানুষেরা একসময় আয়রন ক্যাপসুল নয়, ডালিম খেয়ে দ্রুত সবল হয়ে উঠতো। আগে মানুষের বাড়িঘরের চারপাশে আঙ্গিনায় শাকসবজি ও নানা ধরনের ফুলফলের গাছ থাকতো। বেল কিংবা ডালিম গাছ দু'চারটে করে সবসময়ই থাকতো। বেল গাছ থাকলেও ডালিম গাছ আজকাল আর খুব একটা চোখে পড়ে না। আমরা এগুলো প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছি এমনকি নাম পর্যন্ত ভুলতে বসেছি।

যে দেবী শোককে রহিত করেন তিনিই শোকরহিতা কিংবা শোকহরনি। তাঁর নামের সঙ্গে অশোকের আশ্চর্য মিল! অশোক মানে কোন শোক নেই। অশোক গাছের গাঢ় লাল রঙের ফুল ও মঞ্জরী অনেক ধরনের অসুখ বিসুখ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক বিশেষ করে মেয়েদের নানা রকম জটিলতায় এটি কাজে লাগে। অশোকের বল্কল ও পাতা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

ধন ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক হচ্ছেন দেবী লক্ষ্মী। অতএব ধান গাছের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একেবারেই প্রত্যাশিত। লোকজ একটি সংস্কৃতি এখনও বজায় আছে যখন আমরা দেখি গৃহবধূরা রান্না করার জন্য চালের ভাণ্ডার থেকে চাল নেয়ার সময় তাঁরা প্রণাম করে। আমরা যেমন খাবারের শুরুতে বলে থাকি 'জয় জনার্দন'। আমরা এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দান ও ঐশ্বর্যকে প্রণতি জানাই এবং তার পরিমিত ব্যবহার করি। অনাহুত জনসংখ্যা বাড়িয়ে তাদের জন্য বসতবাড়ি এবং তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে পশ্চিমা ধারায় নির্বিচার ভোগের নিমিত্তে কৃত্রিম চাহিদা তৈরির জন্য অপ্রয়োজনীয় কলাকারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে আবাদি জমি ধ্বংস করতে পারি না।

আমরা আগেই বলেছি মণ্ডপে নব পত্রিকার প্রবেশ ও স্থাপনের পর তাঁকে পূজা করার মধ্যে দিয়েই দুর্গোৎসবের শুরু। নবপত্রিকা স্থাপনের আগে তার কিছু রাজসিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে নিতে হয়। এর মধ্যে হচ্ছে নবপত্রিকার স্নান। নবপত্রিকার স্নানের জন্য নয় প্রকার জল সংগ্রহ করা হয়। নয় প্রকার জল হচ্ছে শঙ্খ, পুকুর, শিশির, পুষ্প, সর্বোষধি, সমুদ্র, সুগন্ধ, রত্নধৌত জল ও তিলতেল মিশ্র জল। স্নানের জলের মধ্যেও এই বিচিত্রিতা জলের বিভিন্ন আধারকে সম্মান জানানোর ইঙ্গিত দেয়। স্নান সমাপনান্তে লাল পেড়ে হরিদ্রাভ জমিনের শাড়ী পরিহিতা নবপত্রিকাকে মন্ডপে গণেশের পাশেই স্থাপন করা হয়। গণেশের পাশে স্থাপিত হয় বলে অনেকে আমরা ভ্রান্তিবশে তাঁকে গণেশের বউ বলে অভিহিত করে থাকি। নবপত্রিকা বা কলাবৌ প্রকৃত পক্ষে গণেশের মা। কারণ নবপত্রিকা হচ্ছে সাক্ষাৎ জগজ্জননী দুর্গা- যাঁর কাছে আমরা বরাভয়, আয়ু, আরোগ্য ও ধন-ধ্যান্যাদি প্রার্থণা করে অর্চনা করে থাকি এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের অফুরন্ত ভাণ্ডারকে নির্বিচারে নি:শেষ না করার স্ব-শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি।

আমরা মহাকবি গ্যেটের একটি উক্তি দিয়ে মহাশক্তি শ্রী শ্রী দুর্গাকে উৎসর্গীকৃত এই ছোট্ট কথাঞ্জলিটুকু শেষ করতে পারি। 'Nature is the living, visible garment of God'. অর্থাৎ প্রকৃতি হচ্ছে ঈশ্বরের জীবন্ত ও দৃশ্যমান পরিচ্ছদ।

গ্রন্থসূত্র: কিরন (১৯৯৪)। পূজা পদ্ধতি ও মূর্তিতত্ত্ব; শ্রী চিন্ময় দাশগুপ্ত, বাঁশখালি, চট্টগ্রাম।

চক্রবর্তী, শ্রী শিবশঙ্কর (২০১০)। জ্ঞানমঞ্জরী সনাতন ধর্মের হাজারো প্রশ্নের উত্তর; আনন্দ পাবলিশার্স, বাংলাবাজার চট্টগ্রাম রায়, সুধাংশু শেখর (২০১২): মিউজিক ও কোরিওগ্রাফী: চলচ্চিত্রের দুই সহোদরা; বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল; শাহবাগ, ঢাকা

লেখক : অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শারদীয় দুর্গোৎসব: অকালবোধন থেকে সর্বজনীন মহোৎসব

ড. রাধেশ্যাম সরকার

শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালির জীবনে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সামাজিক মিলনের এক অমোঘ প্রতীক। দেবী দুর্গার অকালবোধনের পৌরাণিক কাহিনি থেকে শুরু করে রাজকীয় আড়ম্বর, গৃহস্থালি পূজা এবং সার্বজনীন উৎসব এই দীর্ঘ পথচলা হিন্দু বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরের সুস্পষ্ট দলিল। আজকের দিনে দুর্গাপূজা কেবল মণ্ডপের প্রতিমায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা ছড়িয়ে পড়ে শিউলির গন্ধে, কাশবনের দোলায়, ঢাকের তাল ও মানুষের মিলনের উল্লাসে। তাই দুর্গাপূজা একদিকে কেবলমাত্র আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের স্মারক নয়, বরং অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির জীবন্ত সাক্ষ্য বহনকারী এক মহোৎসব, আর অন্যদিকে এটি মানবিকতা, ভ্রাতৃত্ব ও সৌন্দর্যের সর্বজনীন উৎসব। আর এই মহোৎসবের অন্তিম সুরে ভক্ত হৃদয় নম্র প্রণতিতে মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করে, তাঁর আশীর্বাদ কামনা করে জীবনের সব অশুভ শক্তিকে দূরে সরিয়ে ন্যায়, সত্য ও মঙ্গলের পথে চলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যাক্ত করে।

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, মহিষাসুর নামক অসুর স্বর্গ ও পৃথিবী দখল করে দেবতা ও মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তখন দেবতারা একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তি সৃষ্টি করেন-দেবী দুর্গা। দশভূজা রূপে সজ্জিত তিনি দশটি দিক থেকে শক্তি আহরণ করে নানা অস্ত্র হাতে গ্রহণ করেন এবং সিংহবাহিনী নিয়ে মহিষাসুরকে পরাস্ত করেন। মহিষাসুরমর্দিনী রূপের মধ্যেই দুর্গাপূজার মূল তাৎপর্য নিহিত। প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দুর্গাপূজার আসল সময় ছিল বসন্তকাল, অর্থাৎ চৈত্র মাস, যা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। মূলত তখনই দেবীর পূজার বিধান ছিল। এই পূজা কবে থেকে শুরু হলো, কীভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করল, ধর্মীয় তাৎপর্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাল এসবই আমাদের বোঝার প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর নবম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, এককালে রাজা সুরত রাজ্য হারিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। শত্রু ও মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। সেখানে তিনি দেখা পেলেন সমাধি নামে এক বৈশ্যের সঙ্গে, যিনি পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের প্রতারণায় গৃহত্যাগ করেছিলেন। দুজনে একত্রিত হয়ে ঋষি মেধসের কাছে পৌঁছান এবং জানতে চান, মানুষ সর্বস্ব হারিয়েও কেন সংসারের বন্ধন ছাড়তে পারে না। ঋষি তাদের দেবী মহামায়ার মাহাত্ম্য শোনালেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, দেবী মায়া সৃষ্টি করে জীবজগতকে সংসারে বেঁধে রাখেন, আবার তিনিই মুক্তি দান করেন। ঋষির পরামর্শে রাজা সুরত ও বৈশ্য সমাধি দুজন দেবী দুর্গার উপাসনা শুরু করেন। দীর্ঘ তপস্যার পর দেবী তাঁদের সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দেন। রাজা সুরতকে তিনি ভবিষ্যৎ জন্মে রাজা হওয়ার বর দান করেন, আর বৈশ্য সমাধি মুক্তির আশীর্বাদ পান। এই কাহিনী শরৎকালের পূজার প্রাচীন প্রেক্ষাপটকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী, রামচন্দ্রের অকালবোধনের কাহিনীও বহুল পরিচিত। শরৎকালে দেবী পূজার নির্ধারিত ঋতু ছিল না, তাই একে অকালবোধন বলা হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা ভিন্ন সময়ে দেবীর আরাধনা। রামচন্দ্র যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন। 'অকাল' অর্থ অসময়ে এবং 'বোধন' মানে উদ্বোধন। বছরের ছয় মাস, শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত, সূর্য দক্ষিণ দিকে গমন করে দক্ষিণায়ন। এটি দেবতাদের রাত্রি। অপর ছয় মাস, মাঘ থেকে আষাঢ়, সূর্য উত্তর দিকে গমন করে উত্তরায়ণ। তখন দেবতাদের দিন। রামচন্দ্র দেবতাদের রাত্রিকালে পূজা করায়, এটি অকালবোধন হিসেবে পরিচিত।

সীতাকে রাবণ অপহরণ করার পর রামচন্দ্র দুঃখভরা অবস্থায় দেবতাদের শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি দুর্গার আরাধনার সংকল্প নেন। আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে রাম কল্পারম্ভ করেন এবং মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধিপূজা সম্পন্ন হয়। নবমীতে তিনি ১০৮টি নীলপদ্ম অর্পণ করার সংকল্প নেন। তবে একটি পদ্ম গোপন হয়ে যাওয়ায় তিনি নিজের চোখ নিবেদন করতে উদ্যত হন। দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁকে থামান। রামের ভক্তি ও আত্মত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী আশীর্বাদ দেন। এই ঘটনা থেকে শরৎকালের দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' নামে অভিহিত করা হয়, যা আজও আমাদের সাংস্কৃতিক অংশ।

বাংলার ইতিহাসে দুর্গাপূজার সূচনা বিভিন্নভাবে প্রচলিত। এককালে এটি রাজপরিবারের আভিজাত্য ও বিলাসবহুল উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ক্রমে তা গৃহস্থালি পূজা ও সার্বজনীন উৎসবে রূপ নেয়। কেউ বলেন, রাজশাহীর তাহেরপুরে স্থানীয় রাজা কংস নারায়ণ প্রথম আড়ম্বরপূর্ণ পূজা শুরু করেছিলেন। ১৮ শতকে নবকৃষ্ণ দেবের উদ্যোগে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে দুর্গাপূজা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এক নতুন ধারা স্থাপন করে। ধীরে ধীরে গ্রামবাংলা ও শহরের প্রতিটি পাড়া পূজার আনন্দে ভরে ওঠে। ১৭৯০ সালে হুগলির গঙ্গারামপুরে প্রথম বারোয়ারি পূজার সূচনা হয়, যা সার্বজনীন উৎসবের পথ খুলে দেয়।

শরৎকালে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে একে শারদীয় দুর্গোৎসব বলা হয়। মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠে ভেসে আসে দেবীর আহ্বান। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন,

সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান ও পূজা, অষ্টমীতে কুমারী পূজা ও সন্ধিপূজা সব মিলিয়ে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। নবমী মহাসন্ধিক্ষণ, দশমীতে দেবী বিসর্জন। প্রতিটি দিন ভক্তি, আনন্দ, ধূপ-ধুনোর সুবাস, আলোর ঝলকানি এবং ঢাকের তালে পূর্ণ থাকে। দুর্গাপূজা বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। এটি কেবল ধর্মীয় আচার নয়, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপূজাকে রচনায় অমর করেছেন। শিল্পকলায় প্রতিমা গড়া, মণ্ডপ নির্মাণ, আলোকসজ্জা এবং শাড়ির নকশায় বাঙালির সৃজনশীলতা ফুটে ওঠে। আগমনী গান, ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি ও লোকগানের সুরে শারদীয় আবহ সৃষ্টি হয়। দুর্গাপূজা হিন্দু বাঙালির হৃদয়ের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে মিশে আছে যে, এটি কেবল ধর্মীয় আচার নয়; এটি সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত এক বহুমাত্রিক উৎসব। সমাজজীবনেও আত্মীয়-স্বজনের মিলন, বন্ধুদের আড্ডা, নতুন পোশাক, প্রিয়জনের সঙ্গে বেড়ানো ও খাবারের আনন্দ পূজাকে সামাজিক বন্ধনে রূপান্তরিত করে। অর্থনীতিতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ; পোশাক, মিষ্টি, প্রসাধনী, বিনোদন ও ভ্রমণ সবখানেই বাণিজ্যিক উচ্ছ্বাস জাগায়। দুর্গাপূজা তাই ভক্তি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির এক জোড়াস্বরূপ প্রতীক।

বর্তমান সময়ে দুর্গাপূজা কেবল একটি ধর্মীয় আচার আচরণ নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তি, মিডিয়া এবং বিশ্বায়নের কল্যাণে এটি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। পূজার আয়োজন এখন শুধু কলকাতা, ঢাকা বা গ্রামীণ মণ্ডপেই সীমিত নয়; বরং প্রবাসী বাঙালিরা নিউইয়র্ক, লন্ডন, টরোন্টো কিংবা সিডনিতেও সমান উৎসাহ ও ভক্তিভরে এই উৎসব পালন করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ডিজিটাল প্রচার, লাইভ টেলিকাস্ট, অনলাইন চণ্ডীপাঠ কিংবা ভার্চুয়াল পূজা সম্প্রচার সবকিছু মিলিয়ে দুর্গাপূজা এখন বৈশ্বিক বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তবে এই আনন্দযাত্রার পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। পূজা চলাকালে নিরাপত্তাজনিত শঙ্কা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঝুঁকি কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতা মাঝে মাঝে উৎসবের আবহে কালো ছায়া ফেলে দেয়। তাই রাষ্ট্র, প্রশাসন এবং সাধারণ সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব হলো এই মহোৎসবকে নির্বিঘ্ন, শান্তিপূর্ণ এবং সার্বজনীন সম্প্রীতির আবহে সম্পন্ন করা, যাতে দুর্গাপূজা সত্যিই আনন্দ, ঐক্য ও মানবিক বন্ধনের উৎসবে পরিণত হয়। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্গাপূজা শুধুমাত্র হিন্দুদের উৎসব নয়। মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও এতে অংশগ্রহণ করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশালসহ দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলের পূজা মণ্ডপে আন্তঃসম্প্রদায়িক অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। প্রতিবেশী একে অপরের বাড়িতে যান, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, আবার কিছু ক্ষেত্রে খরচ ও নিরাপত্তায় একত্রিত হন।

শারদীয় দুর্গাপূজা আমাদের জীবনে যে মূল শিক্ষাটি তুলে ধরে তা হলো অসুর শক্তির বিনাশ এবং সুন্দরের চূড়ান্ত জয়। পুরাণে উল্লেখিত মহিষাসুরকে আমরা কেবল বাহ্যিক এক দানব হিসেবেই দেখি না; বরং তিনি মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা লোভ, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা ও অজ্ঞানতার প্রতীক। দেবী দুর্গা তাঁর শক্তি, প্রজ্ঞা ও সাহস দিয়ে সেই অশুভ শক্তিকে পরাজিত করেন এবং মানুষের হৃদয়ে ন্যায়, সত্য, করুণা, সমতা ও সৌন্দর্যের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দেন। এই বার্তাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীশক্তির মর্যাদা ও গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়াতে হবে এবং সর্বোপরি মানবিকতার জয়কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আজকের পৃথিবীতে, যেখানে সহিংসতা, বিভাজন, অসহিষ্ণুতা ও অমানবিকতার অন্ধকার প্রতিদিন বিস্তার লাভ করছে, সেখানে দুর্গাপূজার এই শিক্ষাগুলো আরও প্রাসঙ্গিক ও জরুরি হয়ে ওঠে।

শারদীয় দুর্গাপূজা ভক্তি ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের পাশাপশি এটি বাঙালির জীবনের মহামিলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ উৎসবকে ঘিরে একসাথে জড়ো হয় প্রকৃতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও অর্থনীতি যার সমন্বয়ে আমাদের জাতিসত্তা হয়ে ওঠে আরও সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। শরতের নীল আকাশ, শিউলির স্নিগ্ধ গন্ধ, কাশফুলের দোলা, ভোরের শিশিরে ভেজা বাতাস সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অনুপম পরিবেশ। মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা গড়ার শিল্পে ফুটে ওঠে সৃজনশীলতার দীপ্তি, ঢাকের বজ্রনিনাদ আর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় মানুষের প্রাণের স্পন্দন। প্রতিমার চোখে 'চোখে দেখা' নামের সেই বিশেষ মুহূর্ত যেন ভক্তের হৃদয়ে নবীন আবেগ জাগিয়ে তোলে, আর মনে হয় দেবী স্বয়ং পৃথিবীতে নেমে এসেছেন আশীর্বাদ বিলাতে। এই পূজা তাই কেবল ধর্মীয় রীতি নয়, বরং জীবনের কাছে এক নতুন আশার বার্তা নিয়ে আসে, যা মানুষকে ঐক্য, আনন্দ ও ভবিষ্যতের প্রতি আস্থার সোপানে পৌঁছে দেয়।আজ যখন বিশ্বজুড়ে বিভাজন, সংঘাত আর অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে, তখন দুর্গাপূজা আমাদের মনে করিয়ে দেয়: অসুরের বিনাশ একদিন হবেই, আর সত্য, ন্যায় ও সৌন্দর্যই চিরন্তন।

লেখক: কৃষিবিদ ড. রাধেশ্যাম সরকার, চেয়ারম্যান, ডিআরপি ফাউন্ডেশন ও সভাপতি, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, শেরেবাংলা নগর থানা শাখা।

সমকালীন বিশ্বে গীতা-ভাবনা

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
মালবিকা বিশ্বাস

বেদ সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মীয়গ্রন্থ। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণও অনন্য প্রধান ধর্মীয়গ্রন্থ। দীর্ঘ সময়ের সঞ্চিত জ্ঞান এসব গ্রন্থে সন্নিবেসিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের নির্যাসটুকু নিয়ে সরলীকরণ করা হলো গীতায়। প্রচলিত আছে ব্যাস দেব গীতার রচয়িতা। তবে এ বিষয়ে নানা মতের প্রচলন রয়েছে। গীতা ছন্দবদ্ধ শ্লোকে প্রকাশিত যা সকলের কাছে সহজবোধ্য নয়। আমরা সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনুরোধ জানাবো পলল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ও মালবিকা বিশ্বাস-এর "সমকালীন বিশ্বে গীতা ভাবনা" বইটি পড়ার জন্য। "অপরাজিতা" সংকলন পরিষদের পক্ষ থেকে এই বইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সকলের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গীতার কাহিনী সংক্ষেপ

কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে পৈতৃক সিংহাসন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ। পিতামহ ভীষ্মের মধ্যস্থতায় দুপক্ষের মধ্যে রাজ্যভাগ করে দেয়া হয়। রাজা দুর্যোধনের আহ্বানে পাশাখেলার শর্ত হিসেবে রাজ্য হারিয়ে পাণ্ডবগণ তের বছরের জন্য বনবাসে যায়। বনবাস জীবন শেষে ফিরে এসে তারা রাজ্য পেতে চান। কিন্তু দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে সামান্যতম ভূমি দিতেও অস্বীকৃতি জানায়। উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা আনয়নের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও চেষ্টা করে, সফল হতে পারেননি। এমতাবস্থায় কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। এই যুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গও জড়িত হন। ফলে বিরাট যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানটি হলো যুদ্ধের ময়দান।

মহর্ষি ব্যাসদেব অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ দর্শন করার সুযোগ দিতে তার চোখে দিব্যদৃষ্টি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র এ প্রস্তাবে সম্মত হন না। তাঁর অনুরোধে সচিব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দেয়া হয়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কাহিনী গড়ে উঠে।

প্রথম অধ্যায় : অর্জুন-বিষাদযোগ

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় দলের সৈন্য সমাবেশ ঘটেছে। তাদের অবস্থান, প্রস্তুতি সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্র জানতে চাচ্ছেন। এখানেই গীতার আরম্ভ। দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয় উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ ও তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি বর্ণনা করেন। যুদ্ধের প্রস্তুতিজ্ঞাপক তুমুল শঙ্খধ্বনি উত্থিত হয়।

এমতাবস্থায় পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি অর্জুন তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সেনাদলের মাঝখানে রথ স্থাপন করতে বলেন। উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের যোদ্ধাদের দেখে নেয়া, কাদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। কৌরব পক্ষে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যসহ নিকট আত্মীয় স্বজনদের দেখে অর্জুনের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে গুরুজন, আত্মীয়স্বজনসহ উপস্থিত বহু লোককে হত্যা করতে হবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এসব চিন্তা করে অর্জুনের যুদ্ধে জয়লাভ, রাজ্যলাভ কোনোটাই মূল্যবান মনে হয়নি। যুদ্ধের ভীষণ পরিণতির কথা চিন্তা করে অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সমস্ত শরীরে কম্পন, মুখ শুষ্ক, হাত হতে গাণ্ডিব খসে পড়ে। পৃথিবীর অধিপতি এমনকি স্বর্গরাজ্য লাভের বিনিময়েও অর্জুন যুদ্ধ করতে সম্মত নয়। যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্জুন বিষাদযুক্ত হয়ে রথের উপর বসে পড়লেন। অর্জুনের এরূপ মানসিক অবস্থার পরিচয় নিয়ে গীতার এই প্রথম অধ্যায়ের নাম হয়েছে অর্জুন-বিষাদযোগ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাংখ্যযোগ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেও একইভাবে অর্জুন তাঁর যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করেন। গুরুজনদের জীবনের বিনিময়ে রাজ্যলাভের চেয়ে ভিক্ষা করে জীবনযাপনও তাঁর (অর্জুনের) কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তটি যথার্থ কিনা তা জানতে চেয়ে সারথি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি বিনীতভাবে তার মনের অবস্থা ব্যক্ত করে বলেন: "আমি মোহগ্রস্ত, ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আমার নেই, আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছি। আমার পক্ষে যেটি মঙ্গলকর সে বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে ভৎসনা করে কঠিন বাক্যে বলেন: তাঁর এরূপ সিদ্ধান্ত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অর্জুন আত্মীয়-স্বজনদের, গুরুজনদের বধের আশঙ্কায় যুদ্ধ না করার কথা বলছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অর্জুনকে যা অনিবার্য এবং মৃতব্যক্তির পুনর্জন্মও নিশ্চিত। মানুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহটাকে হারায় মাত্র, তার দেহস্থ আত্মার কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, অব্যয়। এর কোনো জন্ম- মৃত্যু নেই। সকল জীবের মধ্যে আত্মা আছে, আর এই আত্মিক সত্তাই জীবের যথার্থ সত্তা। একথা চিন্তা করে জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তির জন্যই পণ্ডিতগণ শোক করেন না।

মনের চঞ্চলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সমত্ত্ব বুদ্ধিতে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেন তিনি। অর্জুনের মনে রাখা দরকার, কর্তব্যকর্ম অবশ্যই করণীয়, কর্মেই তার অধিকার, কর্মফলে নয়। কর্মত্যাগের প্রতিও যেন তাঁর উৎসাহ না জাগে। ইন্দ্রিয় সংযম, সমত্ত্ব যোগ এবং বুদ্ধি যোগের প্রতিও অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অর্জুন তখন স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা জানতে

চান। ভগবান তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেন। লাভ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ বিষয় নিয়ে বিচলিত হন না। নিরাসক্ত, ভয়হীন, ক্রোধশূন্য অবস্থা তার মধ্যে ব্যক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলো তার বশে থাকে, চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না। মনে রাখা দরকার যার ইন্দ্রিয় সর্ব প্রকার বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।" এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির জীবনচর্চার মধ্যেই ব্রাহ্মী স্থিতির প্রকাশ এবং এরূপ অবস্থার অন্তে ব্রহ্মনির্বাণ/বা মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। গীতার এই দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম সাংখ্যযোগ।

তৃতীয় অধ্যায় : কর্মযোগ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম করার উৎসাহ এবং ব্রাহ্মী স্থিতির জ্ঞানময় বর্ণনা শুনে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছে কর্ম, না জ্ঞান কোন পথ তাঁর অনুসরণীয়। উত্তরে ভগবান কর্মের মাহাত্ম্য ও কর্মানুশীলনের পদ্ধতিসমূহ ব্যক্ত করেছেন। আর এজন্য গীতার তৃতীয় অধ্যায়কে কর্মযোগ বলা হয়।

কর্ম অবশ্যই করণীয়। কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা যায় না। তিনি কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে বলেন, বাহ্যিক কর্ম ছেড়ে দিলেও মানুষ দেহযন্ত্রের কর্মগুলোকে ত্যাগ করতে পারে না। সুতরাং কর্ম ত্যাজ্য নয়। কর্ম অবশ্যই করণীয়। সন্ন্যাসবাদীদের মতে, মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগ আবশ্যক। একথা কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ত্যাগের প্রয়োজন নেই। কাম্যকর্মে মানুষের বন্ধন হয়; কর্মফল ভাগের জন্য জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু নিষ্কামভাবে, অর্থাৎ, কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে, ঈশ্বরের নিয়োজিত ব্যক্তি হিসেবে যথা প্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ সম্ভব। এ নিষ্কাম কর্মের অনুশীলনকারী রাজর্ষি জনকও মুক্তিলাভ করে গেছেন। এখানে যজ্ঞকর্মের কথা এসে পড়েছে। সৃষ্টির মূলে যজ্ঞ, সৃষ্টি রক্ষায় যজ্ঞ। এভাবটি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। ঈশ্বর প্রীত্যর্থে মানবের কল্যাণার্থে জগৎজীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যে কর্ম সেটি যজ্ঞকর্ম। সংক্ষেপে, দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য যে কর্ম সম্পাদন করা হয় সেটি যজ্ঞকর্ম। পরহিতার্থে কর্মকে সম্পাদন করতে পারলেই সেটি যজ্ঞকর্ম হবে। এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত অগ্নিতে আহুতিদানকে যে বৈদিক যজ্ঞকর্ম বলা হতো সে কর্মটিই দেবতার উদ্দেশ্যে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে, মনুষ্যগণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়ে যজ্ঞকর্মের প্রসার ঘটেছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডই একটি বিশাল যজ্ঞক্ষেত্র। এই মহাযজ্ঞশালায় সৃজন, পালন, লয়াদি কর্ম চলছে অনাদি কাল থেকে। সুতরাং, মানুষের কর্মে যে বন্ধন হয় সেটি যজ্ঞকর্মে থাকে না। এখানে অর্জুনের জিজ্ঞাসা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ কেন পাপ কর্মে লিপ্ত হয়? উত্তরে ভগবান রজোগুণের প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। রজোগুণের প্রভাবে মানুষ লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে কাম-ক্রোধের মধ্যে নিমগ্ন হয়। এর ফলে সে নিজেকে পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। তবে এ থেকে উদ্ধার পেতে হলে মনে রাখতে হবে, ইন্দ্রিয় সংযম অনুশীলন করে স্থির বুদ্ধিতে এবং পরে বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আত্মা-এই চিন্তায় নিবিষ্ট হতে হবে। এরূপভাবে কামরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়।

চতুর্থ অধ্যায় : জ্ঞানযোগ

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কর্মযোগের সূত্র ধরেই চতুর্থ অধ্যায়ের অবতারণা। শ্রীভগবান বলেছেন, কর্মনিষ্ঠ এ জ্ঞানযোগ অব্যয় এবং পুরাতন। এই অব্যয়যোগ তিনি সৃষ্টির আদিতে বিবস্বানকে (সূর্যকে), বিবস্বান (মানবজাতির জনক) তাঁর পুত্র মনুকে এবং মনু তার পুত্র ইক্ষাকুকে (এই ধর্ম) বলেছিলেন। এমনিভাবে রাজর্ষিদের মধ্যে এই ধর্ম পিতা-পুত্রের ধারায় চলে আসছিলো। কিন্তু এক সময় কোনো অযোগ্যে সন্তান এই অব্যয় কর্মযোগটি ধরে রাখতে না পারায় সেটি ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়েছে। তাই সেই পুরাতন কর্মনিষ্ঠ অব্যয়যোগের কথা ভগবান নতুন করে তার প্রিয় শিষ্য ও সখা অর্জুনকে বলতে যাচ্ছেন।

এখানে অর্জুনের মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু পূর্ব হতে সূর্য কিরণদান করে চলছে। এমতাবস্থায় কৃষ্ণ কীভাবে সূর্যকে কর্মযোগ তথা অব্যয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। উত্তরে ভগবান বলেন : তাঁর এবং অর্জুনের বহু জন্ম অতীত হয়েছে, সে কথা অর্জুনের মনে নেই; কিন্তু ভগবানের স্মরণে রয়েছে। ভগবান তাঁর দিব্যজন্মের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি জন্মরহিত, অব্যয়, আত্মা, প্রাণীদের প্রভু হয়েও আপন মায়াশক্তি অবলম্বন করে ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হন। আর তার আবির্ভাবের সময়কালের বাধা-নিষেধ নেই। যখন যেখানে ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের উপর নির্যাতন নেমে আসে, তখন সেখানে ভগবান আবির্ভূত হয়ে ধার্মিকদের উদ্ধার, দুর্জনের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন করে থাকেন। তবে ভগবানের অবতাররূপে আগমন কোনো জাগতিক ব্যাপার নয়, এটি একটি দিব্য ঘটনা। অবতারের জন্ম ও কর্ম উভয়ই দিব্যভূমির ব্যাপার, তবে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করা যায় ভূপৃষ্ঠে। ভগবানের দিব্যজন্ম, অর্থাৎ অবতার পুরুষের আবির্ভাব যিনি তত্ত্বত জানতে পারেন তিনিই মোক্ষলাভের যোগ্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পরম উদার ধর্মমতের প্রচার করেছেন। মানুষ পরমার্থলাভের প্রক্রিয়া হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ অনুসরণ করলেও সব সাধনপথেই ভগবানের অনুগ্রহলাভ সম্ভব। সকল সাধনপথেরই চূড়ান্ত পর্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করছেন। সমাজজীবনের প্রচলিত চতুর্বর্ণের স্রষ্টাও তিনি। তিনি গুণ ও কর্মের তারতম্য অনুসারে মানবসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারশ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। কর্মানুশীলনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানে উত্তরণের পথ দেখাতে গিয়ে কর্মকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন : কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম। কর্ম হচ্ছে শাস্ত্র নির্দেশিত কর্ম; শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম বিকর্ম; এছাড়া কর্মসন্ন্যাসের নাম অকর্ম। কর্ম তত্ত্বটি জটিল। তবে কর্ম থেকে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আর সেটি বোঝানোর জন্য যজ্ঞকর্মের কথার

অবতারণা, ফলাকাঙ্খাযুক্ত কর্মে বন্ধন, নিষ্কামকর্মে মোক্ষলাভ। কামনাশূন্য নিষ্কামকর্মের প্রকাশ ঘটে পরোপোকারিতা, জগৎ-কল্যাণকর যজ্ঞকর্মের মধ্য দিয়ে। আর অহংকার ও ফলাসক্তি ত্যাগ করে জগৎ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে কৃতকর্মই যজ্ঞ। সংক্ষেপে, পরার্থে সম্পাদিত কর্মই যজ্ঞ। দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা আছে। তবে জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। জ্ঞানযজ্ঞে সাধকের পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ হয়। মানবজীবনকে পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণই হলো এই জ্ঞানযজ্ঞের মূলকথা। এ পর্যায়ে সাধকের ক্ষুদ্র সসীম আমিত্ব অসীম ভূমানন্দে পর্যবসিত হয় : "জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"।

কথা সংক্ষেপ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামকর্মের অনুশীলন দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ করে নিঃসংশয় চিত্তে যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করে স্বধর্ম পালন তথা যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ কর্মে অর্জুনকে পাপ স্পর্শ করবে না। স্বধর্ম পালন সকলেরই অবশ্য করণীয়।

পঞ্চম অধ্যায় : সন্ন্যাসযোগ

সন্ন্যাসযোগ গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও কর্মযোগের বিষয় এবং কর্মফলাফল সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে বলে এই অধ্যায়ের নাম সন্ন্যাসযোগ। অর্জুনের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে গীতার কথা ক্রমশ এগিয়ে চলছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে ভগবান কর্মসন্ন্যাস তথা সন্ন্যাসযোগের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে কর্মযোগের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এমতাবস্থায় অর্জুনের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে যে, জ্ঞানের প্রশংসা করতে করতে ভগবান আবার কেন কর্মের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে চান, জ্ঞান এবং কর্মযোগ এ দুয়ের মধ্যে তার পক্ষে কোনটি শ্রেয়ঙ্কর। উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলছেন, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ এবং এদের মধ্যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাস ও কর্মযোগের ফল একই হয়ে থাকে। এটি দেখিয়ে ভারতীয় দর্শনসম্মত সাংখ্যযোগ ও যোগদর্শনের সমন্বয়ের কথা তুলে ধরেছেন। পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সাংখ্য ও যোগের গন্তব্যস্থল একই। এদের সাধন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন অবস্থা দৃষ্ট হলেও পরিণতিতে এরা একই মোক্ষে উপনীত হয়। তবে স্বভাব বশত যোগী পুরুষ সংযত ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-মন নিয়ে জগতের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অপরদিকে কর্মসন্ন্যাসী নিঃস্পৃহ হয়ে জ্ঞানের আলোতে জগৎ-কল্যাণের কর্মে আত্মনিয়াগে করেন। এভাবে জ্ঞানবান সাধকের দৃষ্টিতে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। কর্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে, আবার জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে কর্মের মধ্যে। এই সমন্বয়টি ঘটে সম্যক দর্শনের ফলে। সম্যক দর্শন হতে সমদর্শন। আর তখন জ্ঞানী সাধক ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভি, হস্তী, কুকুর, বিড়াল আত্মবৎ দর্শন করেন। সবার মধ্যে আত্মার অবস্থান উপলব্ধি করে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হয়ে থাকেন। তখন তারা প্রিয় বস্তুলাভে উৎফুল্ল অপ্রিয় লাভে রুষ্ট হন না (৫/২০)। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, ইন্দ্রিয়ারাম অন্বেষী ব্যক্তি কখনো কর্মযোগী হয় না। আত্মাতেই যিনি শান্তির সন্ধান পেয়েছেন তিনিই কর্মযোগী হতে পারেন। আত্মারামে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই কর্মযোগের যথার্থ অধিকারী। বিষয় কামনা থাকলে মনে কাম-ক্রোধের প্রভাব এসে পড়ে। যিনি কাম-ক্রোধের বেগ প্রতিরাধে করতে পারেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বরযুক্ত বা ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে যুক্ত বলেই এ সাধক ইন্দ্রিয় সুখের উর্ধ্বে বিরাজ করতে পারেন। পরমবস্তুর আস্বাদ পাবার জন্য সাধককে অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা প্রবলভাবে অনুশীলন করতে হবে।

কর্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয় সাধন রীতিতেই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে আত্মশুদ্ধিলাভ আবশ্যক। আর এমন অবস্থায় সাধকের হৃদয়ে ঘটে নির্মল ব্রহ্মানন্দ। তখন সাধক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব রকম সাধন প্রক্রিয়ার অধীশ্বর, জগতের নিয়ন্তা এবং সর্বজীবের বন্ধু জেনে পরমশান্তিলাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বর্ণনার মধ্য দিয়ে গীতার তত্ত্বকথা ক্রমশ এগিয়ে চলছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ তথা সমাধিযোগের প্রক্রিয়াসমূহ বর্ণিত হওয়ায় এই অধ্যায়ের নাম হয়েছে ধ্যানযোগে বা অভ্যাসযোগ। ধ্যানযোগ কথাটির আভাস পাওয়া গেছে পূর্ববর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসে ধ্যান অনুশীলন এবং ধ্যান অনুশীলনকারী যোগীর লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি যে কর্মযোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটিও এখানে উপদিষ্ট হয়েছে। কর্মযোগের মূলকথা: ভাগোকাক্ষা বর্জিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করা। আবার যোগসাধনারত যোগীর পক্ষেও বাসনামুক্ত অবস্থায় সাধনায় রত হওয়া আবশ্যক। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভোগাকাঙ্খাশূন্য যিনি কর্মযোগী, তিনিই জিতেন্দ্রিয় যোগারুঢ় সাধকের সমগাত্রোীয়। লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ অনুভূতি সমচিত্ততা যোগের উৎকৃষ্ট লক্ষণ।

যোগ সাধনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি যোগাভ্যাস করবেন, তাকে প্রথমে নির্জন, পবিত্র স্থান বেছে নিতে হবে। ধ্যানের আসনে উপবেশন করে যোগী ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণে এনে মনকে একাগ্র করে আত্মশুদ্ধিলাভ করবেন। যোগী মনকে কামনাশূন্য করে আনার চেষ্টায় রত থাকবেন। এরপর সংযত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হতে প্রত্যাহার করবেন। এ অবস্থায় মনকেও বুদ্ধির দ্বারা অন্তর্মুখী করে ক্রমে ক্রমে চিত্তবৃত্তির গতিরাধে করতে হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় যোগী কোনো বিষয় চিন্তা করবেন না। তখন চিত্তবৃত্তি ক্রমে আত্মস্থ হয়ে স্থির হবে। ইন্দ্রিয়-মন সংযত অবস্থায় আত্মবৃত্তিতে স্থিত হলে তখন যোগীর অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। তখন যোগী ব্রহ্মানন্দস্বরূপ পরমশান্তি লাভ করেন। কোনোরূপ দুঃখ-যন্ত্রণা তাকে বিচলিত করতে পারে না। যোগারু ব্যক্তির সমদর্শনলাভ হয়; আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে থাকেন। তবে এই আত্মদর্শনই যোগসাধনার চরম পর্যায় নয়। যোগী একাধারে আত্মারাম এবং উত্তম ভক্ত। এ অবস্থাটির মধ্যে

যোগীর পরম-আনন্দানুভূতি হয়ে থাকে। তখন যোগী প্রাণপ্রিয়তম ভগবানকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং ভগবানকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করে আনন্দে পুলকিত হন। এ অবস্থাটি ভগবানের কথায় ভক্ত ও ভগবান দুজনই পরস্পরের দৃষ্টিগাচের হয়ে থাকেন।

এখানে প্রশ্ন এসেছে মনের চাঞ্চল্য নিয়ে। তবে চঞ্চল মনকে বশে আনা যায় কঠোর অভ্যাস ও তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা। যোগীদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি ভগবদভক্ত ও কর্মী হয়েও জ্ঞানী। জ্ঞানী হয়েও ভক্ত। এ সমন্বয়ের রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায় গীতার এই ধ্যানযোগে।

সপ্তম অধ্যায় : জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ

ষষ্ঠ অধ্যায়, যাকে অভ্যাসযোগ নামে অভিহিত করা হয়েছে, সেখানে ভগবান বলেছেন, যোগীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি গেরস্থ হয়ে অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যেয়-পরমবস্তু হিসেবে স্থাপন করেন। পরমেশ্বরের স্বরূপ কীরূপ এটি জানাই জ্ঞান এবং এই স্বরূপ চিন্তাটি কেমন করে অনুভবে আনা যায় সেই প্রক্রিয়াই বিজ্ঞান। জ্ঞান ও বিজ্ঞান মিলে এই অধ্যায়ের নাম হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানযোগ।

এই জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগে প্রবেশ করার পূর্বেই শ্রীমদ্ভগবদগীতার পূজ্যপদে ভাষ্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গির একটু পরিচয় নেয়া আবশ্যক। গীতার আঠারটি অধ্যায়কে তিনটি ষটুকে বিভক্ত করে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বেদের মহাবাক্য তত্ত্বমসি'এর 'তৎ', 'ত্বং' ও 'অসি'-এই পদত্রয় নিয়ে তিনষট্কে ব্যাখ্যা করে গেছেন। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ের শেষে আমরা। গীতার দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনাতে সপ্তম অধ্যায়ে প্রবেশে প্রস্তুত হয়েছি। জ্ঞান, বলতে বোঝায় শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান, আবার বিজ্ঞান হচ্ছে অনুভূতিমূলক জ্ঞান।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে মানবীয় দৃষ্টিকোণ হতে কথা বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয় বীর অর্জুনের যুদ্ধ করা কর্তব্য, তবে সেই যুদ্ধ করতে হলে তাঁকে জ্ঞানীও হতে হবে। দ্বিতীয় ষটুকে, অর্থাৎ, সপ্তম অধ্যায় থেকে ঈশ্বরীয় ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রথম ষট্কের কর্ম প্রাধান্য শেষে দ্বিতীয় ষট্কে ভক্তির পথে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। মানবীয় দৃষ্টি ছেড়ে স্বর্গীয় দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস। সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতেই বিষয়ের ভূমিকা। এরপর আলোচ্যে বিষয়কে চারটি প্রকরণে বিভক্ত করা যায়। প্রকৃতি-প্রকরণ (৮-১২), ত্রিগুণ প্রকরণ (১৩-১৫), চতুর্বিধ ভক্ত প্রকরণ (১৬-২৩) এবং পরমভাব প্রকরণ (২৪-৩০)। শ্রীভগবান এই অধ্যায়ের শুরুতেই তার অপরা ও পরা প্রকৃতি সম্পর্কে বলছেন। অপরা প্রকৃতি বুদ্ধি, অহংকার, মন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আবার জীবভূত প্রকৃতিই ভগবানের পরা প্রকৃতি। এটাই সমস্ত জগৎ ধারণ করে আছে। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের আভাস এখানে স্পষ্ট। গীতার মতে, পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি পৃথক তত্ত্ব নয়, আবার এক তত্ত্বও নয়। এদুটো একই পরমবস্তুর দ্বিবিধ প্রকাশরূপ। গীতায় পুরুষকেই। পরা প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকেই অপরা প্রকৃতি ধরে নেয়া হয়েছে। এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই জগতের সৃষ্টি। তবে শ্রীভগবান স্বয়ং এই জগতের মূলকারণ এবং প্রলয়ে জগৎ ভগবানেই লয়প্রাপ্ত হয়। জগতের সকল বস্তুর উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ ভগবান স্বয়ং। জগতের বস্তুসমূহ তাঁরই (ভগবানের) সত্তায় সত্তাবান। পরমেশ্বর হতেই বিশ্বের উদ্ভব এবং তাতেই লয়। জগৎ ঈশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত; তবে ঈশ্বর এদের মধ্যে থাকেন না। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা হয়েও নির্বিকার। তিনি প্রকৃতির অধীন নন, প্রকৃতিই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ মাত্র। প্রকৃতির প্রভাবে মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষ নির্বিকার পরমেশ্বরকে জানতে পারে না। তবে ভগবানের প্রিয় পাত্র যারা, ভগবানের অনুগ্রহে তারা দুস্তর মায়ারূপ সাগর উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। এই সংসারে চার রকম ব্যক্তিই ভগবানকে ভজনা করেন: আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এদের মধ্যে জ্ঞানবান ভক্তই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অপর তিন প্রকারের ব্যক্তিগণ মায়ায় মোহিত হয়ে থাকে। ভগবানের শরণাগত হয়। এদের অনেকে স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদের কামনায় বিশেষ বিশেষ দেবতার আরাধনা করে থাকে। জগতের অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভগবানের পরম-অব্যক্তস্বরূপ জানতে না পেরে অবতারস্বরূপ ভগবানকে তারা প্রকৃত মানবরূপই মনে করে। কিন্তু পুণ্যবান নিষ্পাপ সাধকগণ মায়ামুক্ত হয়ে ভগবানকে ভজনা করে থাকেন। অবতার পুরুষের মধ্যেই ভগবৎ-সত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং মায়ামুক্ত হয়ে ভগবানকেই ভজনা করেন। এখানে অবতার পুরুষ বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মনুষ্যরূপ বোঝানো হয়েছে। তিনি যে সমস্ত বিশ্বনিয়ন্তা (omnipresent), সর্বশক্তিমান (omnipotent), সর্বজ্ঞ (omniscient) এ অবস্থাটি অনুধাবন করে ভগবৎভক্তগণ জরা-মরণ হতে মুক্তিলাভের জন্য তদ্গতচিত্ত হয়ে ভগবানের আরাধনা করেন। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ যেমন, ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং অধিভূত, অধিদেব, অধিযজ্ঞস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন এবং ভগবানকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে পরমগতি লাভ করেন।

অষ্টম অধ্যায় : অক্ষর-ব্রাহ্মযোগ

গীতার এই অষ্টম অধ্যায়ে পরমেশ্বর তথা ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা, অক্ষরব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মোপাসনা, অন্তিম সময়ে ব্রহ্মচিন্তায় মোক্ষলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে বলে এই অধ্যায়ের নাম হয়েছে অক্ষর-ব্রহ্মযোগ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন, তাঁর আশ্রিত ভক্তগণের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব অধিগত হয় বলে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞসহ ঈশ্বরকে জানলে অন্তিম সময়েও ঈশ্বরের কথা তাদের স্মরণে থাকে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের মনে উক্ত তত্ত্বসমূহ জানার ইচ্ছা জাগে। তখন অর্জুনের জ্ঞাতার্থে ভগবান যা বলেছেন তার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ভগবানের নিরগুণ অক্ষরভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব। আবার ভগবানের নানা বিভূতি, স্রষ্টারূপে তার সগুণ স্বভাব বা বিভাবগুলোই অধ্যাত্মতত্ত্ব, বিশ্ব সৃষ্টি আদিকর্মতত্ত্ব,

জীবসকল অধিভূত আর জীবের মধ্যে যে চৈতন্য সেটি অধিদৈবত-এসব ভগবানেরই গুণসমূহ। আবার অধিষজ্ঞরূপে ভগবানই যজ্ঞের অধীশ্বর। সংক্ষেপে, এ সকলের মধ্যেও ভগবানের প্রকাশ; আর জীবের কর্মের মধ্য দিয়ে ভগবানের কর্ম চলছে। এভাবে জাতে পারলে ভগবানকে জানা যায় এবং জীব এ জ্ঞানলাভ করে মুক্তিলাভ করে।

অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান বলছেন, মৃত্যুকালে যিনি, যেভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেভাবই প্রাপ্ত হন। সুতরাং, মৃত্যুকালে, ভগবানকে স্মরণ করতে পারলে তাকেই পাওয়া যায়। এখানে লক্ষণীয়, মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করা তাদের পক্ষেই সহজ যারা সমস্ত জীবনভর ভগবানের স্মরণ-মনন অভ্যাস করেন। অতএব, সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করাই হচ্ছে মুক্তিলাভের উপায়।

মৃত্যুসময়ে কীভাবে ভগবানকে অনুধ্যান করতে হয় সে বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। সাধক মৃত্যুকালে যোগবলে প্রাণকে যুগলের মধ্যে স্থাপন করে সংযত ইন্দ্রিয় ও মন নিয়ে অক্ষর পরম-পুরুষকে চিন্তা করতে পারলে সদগতিলাভ করতে পারেন। তবে এ ধরনের সাধন প্রক্রিয়াগুলো মৃত্যুকালে অনুশীলন করা সহজসাধ্য নয় কিন্তু ভগবানের ভক্তগণ অনন্য চিত্তে সতত ভগবানকে স্মরণ করেন বলে তারা অক্লয়াসে ভগবানকে পেয়ে থাকেন। দৈব-উপাসকগণ সাধনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হলেও পুনর্জন্মে নিপতিত হন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত তাকে লাভ করে পুনর্জন্ম হতে মুক্ত হন। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে বুদ্ধিমান সাধকগণ সংসারে আবদ্ধ হয়ে এমন কাম্যকর্মাদিতে লিপ্ত হন না। তখন তারা মুক্তিপ্রদ জ্ঞানযোগ, নিষ্কামকর্মযোগ বা ভক্তিযোগ অবলম্বন করে থাকেন। এভাবে জ্ঞানকর্ম-ভক্তি মিশ্রযোগই সাধকের অনুসরণীয় হয়ে থাকে।

নবম অধ্যায় : রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ

গীতার নবম অধ্যায়কে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভক্তিপথে ঈশ্বর আরাধনার বিস্তারিত উপদেশ দেয়ার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান বলছেন, এই সাধনপদ্ধতি সুখসাধ্য এবং প্রত্যক্ষাবগম্য, এটি সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুহ্যতম বিদ্যা। ভক্তির পথে সাধনার উপদেশ সূচিত হয়েছে সপ্তম ও পরবর্তীতে অষ্টম অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। এটি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে।

এই ভক্তিতত্ত্বের অবতারণার পূর্বে শ্রীভগবান স্বীয় নিরগুণ সগুণ ভাবটির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অব্যক্তমূর্তিতে ভগবান জগৎ ব্যাপী রয়েছেন। তিনি জগৎস্রষ্টা হয়েও অকর্তা, সর্বভূতের অধীশ্বর, জীবের প্রভু, নিবাস, সুহৃৎ। ভগবান অবতাররূপে জীবদেহ ধারণ করে এলে অবিবেকী অসুরস্বভাবের জনগণ ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলেই মনে করে। এদের ধর্মকর্ম সফল হয় না; অপরদিকে, সাত্ত্বিক স্বভাবের সাধকগণ অবতার পুরুষকে সর্বভূত মহেশ্বর জেনে অনন্যচিত্তে ভগবানের ভজনা করে থাকেন। এছাড়া জ্ঞানযোগী দ্বৈত-অদ্বৈত নানাভাবে ভগবানের উপাসনা করেন। আবার কোনো কোনো সাধক স্বর্গাদিলাভের ইচ্ছায় বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুশীলন করে থাকেন। এরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পুণ্যফলস্বরূপ স্বর্গাদিলাভ করেন বটে, কিন্তু তাদের মোক্ষলাভ হয় না। অপরদিকে, যেসকল ভক্ত নিবিষ্টচিত্তে ভগবানের ভজনা করেন তাদের জাগতিক পার্থিব প্রাপ্তি ও তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভগবান নিজেই করে থাকেন। ভক্তের অধীন ভগবান। তিনি ভক্তের যোগ ও ক্ষেম বহন করে থাকেন।

এই ভক্তবৎসল ভগবানের পূজা-অর্চনার জন্য মূল্যবান উপকরণের প্রয়োজেন হয় না। অন্তরে ভক্তি নিয়ে অনন্যচিত্তে ভগবানকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যা কিছু অর্পণ করা হয় ভগবান তা গ্রহণ করে থাকেন। ভক্তের ভক্তিমিশ্রিত উপহার ভগবানের বড়ই প্রিয়বস্তু। ঈশ্বর-অর্পিত বুদ্ধিতে যা কিছু করা হয় সে কাজটি পুণ্যকর্মই হয়ে থাকে। ভগবান ভক্তের অন্তর দেখেন। তিনি দ্রব্যের কাঙ্গাল নন, তিনি ভক্তিতে প্রীত। দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনুশাচেনায় দগ্ধ হয়ে ভক্তিপূর্বক ভগবানের ভজনা করেন, তবে সে দুরাচার ব্যক্তিও ভগবানের করুণা পাবার যোগ্য হয়ে উঠে। ভক্তি পরশমণি। অতএব, ভক্তিমান হয়ে ভগবানের পূজা-আরাধনা করতে পারলে ভগবানকে লাভ করা যায়।

এই রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ অধ্যায়টিতে ভক্তি পথের সাধনার বিশিষ্ট লক্ষণ ও ভক্তির উদারতার সর্বজনীনতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, সমাজের সকল শ্রেণির লোকে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ঈশ্বর আরাধনায় সমান অধিকার। তবে ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন অসুস্বভাবের ব্যক্তিদের নিকট ভগবান সহজলভ্য নন। এই তত্ত্বটি সাধনপথের এক নিগূঢ় সংবাদ, এজন্যই একে গুহ্যশাস্ত্র বলা হয়েছে।

দশম অধ্যায় : বিভূতিযোগ

প্রিয় সখা অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ভগবান সাধনপথের তথা ভক্তিপথে আরাধনার তত্ত্বটি ক্রমশ প্রকাশ করে চলছেন। আর সে সঙ্গে ভগবানের স্বরূপটিও কিছু কিছু ব্যক্ত হয়ে পড়ছে। সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে অক্ষরব্রহ্মযোগ শুনে অর্জুনের জানার আকাক্ষা উজ্জীবিত হয়েছে। অক্ষর-ব্রহ্মযোগ এবং রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ শুনতে শুনতে ভগবানের বিভূতিসমূহ জানার প্রবল বাসনা অর্জুনের মনে উদিত হয়। ভক্তের বাঞ্ছাকে পূর্ণ করার ইচ্ছায় ভগবান তাঁর বিভূতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে শুরু করেন বিধায় এ অধ্যায়কে বিভূতিযোগ বলা হয়েছে।

বিভূতি শব্দের অর্থ বিশেষভাবে হওয়া। ভগবান বিশ্বচরাচরে কোথায় কি হয়েছেন তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে ব্যক্ত করেছেন। ভগবান সৃষ্টির আদিতত্ত্ব, দেবতারাও তাকে সম্যক জানেন না। কারণ দেবগণেরও আদিকারণ ভগবান স্বয়ং। তবে যে ভক্ত ভগবানকে অনাদি, অজ, সর্বলাকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনি মোহশূন্য হয়ে সকল রকম পাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন।

জীবের মধ্যে যে জ্ঞান-বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, অনুরাগ-বিদ্বেষ ভাবসকল দেখা যায়-এগুলোর মূলে রয়েছেন ভগবান। মহর্ষি দেবর্ষি, মুনি-ঋষিগণের মধ্য দিয়ে ভগবানের প্রকাশ এবং তাদের মধ্য দিয়েই জগতের মানবকুলের ক্রমবিস্তরি। এই সকলের মধ্যেই ভগবানের বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য প্রকটিত। তাই ভগবৎ চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত ভক্তগণ সর্বক্ষণ পরস্পর ভগবানের কথা আলাপ

এবং তার লীলাকীর্তন করে পরম সন্তোষলাভ করেন। এভাবে ভগবানে অর্পিতচিত্ত ভক্তগণ পরমপ্রীতিতে ভগবানের ভজনা করে বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হন এবং পরিণতিতে ভগবানকে লাভ করে থাকেন।

ভগবানের মুখে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব শুনতে শুনতে অর্জুন বিমুগ্ধচিত্তে ভগবানের অশেষ গুণ-সম্ভারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে ভগবানের বিভূতিসমূহ জানতে প্রার্থনা জানান। উত্তরে ভগবান তার অশেষ বিভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে শুরু করেন। ভগবান অসীম-অনন্ত, তাঁর বিভূতি বিস্তারেরও অন্ত নেই। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য। সর্বাবস্থায় ভগবানের অশেষ প্রকাশ রয়েছে। আদিত্যগণের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে শংকর, বায়ুগণের মধ্যে মরীচি। এভাবে বৈচিত্র্যময় জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে ভগবানের বিভূতি প্রকাশিত। কথা সংক্ষেপ করে তিনি বললেন, বিভূতির শেষ নেই, তবে সর্বভূতের যা বীজস্বরূপ সেটিই ভগবান। বিশ্বে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত এবং শ্রীসম্পন্ন বা অমিত শক্তিময় সেখানেই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে থাকে। তবে ভগবানের বিভূতির শেষ নেই। সংক্ষেপে বলা যায় ভগবান তাঁর একাংশের দ্বারা বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। তাঁর মহিমার স্বরূপ সমগ্র জীবের পক্ষে অচিন্তনীয় ও অজ্ঞেয়।

একাদশ অধ্যায় : বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ

গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে তার অশেষ বিভূতির কথা শুনে অর্জুনের উপলব্ধি হয় বিশ্বচরাচরের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং এবং তাঁরই তেজশক্তির মহিমা প্রকাশ ঘটেছে জগতের মহিমময় বস্তুসমূহে। তাই অর্জুনের মনে বিশ্বচরাচর তথা বিশ্বরূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে এবং তিনি বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরাধে করেন বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য। অর্জুনের প্রার্থনা পূরণের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। আর এ জন্যই গীতার একাদশ অধ্যায়কে বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান তাঁর সখা অর্জুনের প্রার্থনায় যোগবলে স্বীয় কলেবরে বিশ্বরূপ প্রকটিত করলেন। বিশ্বরূপে বিধৃত দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র প্রভৃতির প্রতি অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু দেখলেন অর্জুনের দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়ছে না। তখন বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য শ্রীভগবান কৃপা করে অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন। অর্জুন এবার বিশ্বরূপের দৃশ্যটি অবলাকেন করছেন। দেখছেন ব্রহ্মাসহ যাবৎ দেবগণ, ঋষিগণ, অনন্ত বাসকী, স্থাবর-জঙ্গম, পশু, কীটপতঙ্গ-এর সবকিছুই বিশ্বরূপের মধ্যে রয়েছে। অর্জুন বিশ্বরূপকে কিরিটধারী, চক্রধারী, গদাপদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজরূপ প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি আরো দেখলেন, বিশ্বরূপ শঙ্খচক্র, কিরিট, গদাধারী। তাঁর অপরিমেয় জ্যোতিতে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত। বিশ্বকাপের মধ্যে সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হচ্ছে।

দেখতে দেখতে অর্জুনের সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা হলো। বিশ্বরূপের ভয়াল বিকৃত মুখগহ্বরের মধ্যে প্রলয়ের অনল প্রজ্বলিত হয়েছে এবং সেই অগ্নিতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণসহ বীরযোদ্ধাগণ সকলেই প্রবেশ করছেন। আর বিশ্বরূপ তাঁর করাল দন্তের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে তাদেরকে খাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে অর্জুনের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং এই প্রলয়ংকর মহাকালের কাছে তিনি তাঁর পূর্বপরিচিত সাম্যরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা জানান।

বিশ্বরূপ তাঁর মহাকাল মূর্তি সংবরণ করে অর্জুনের প্রার্থনা মতো চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ এবং পরে দ্বিভুজ সারথিরূপ ধারণ করেন। অর্জুনকে অভয় দিয়ে প্রকৃতস্থ করে বিশ্বরূপ দর্শনের মহিমা ও দুর্লভতার কথা প্রকাশ করলেন। ভগবানের এ দিব্যরূপ তথা বিশ্বরূপ বেদজ্ঞান, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মকর্মের দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়। তবে এটি একমাত্র অনন্যাভক্তিতে এবং ভগবানের কৃপার ফলে ভক্ত ভগবানের ঐশ্বর্যময় রূপ দর্শন করতে, জানতে এবং তাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হন।

পরিশেষে ভগবান বলছেন, যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসাভাবশূন্য অনাসক্তচিত্তে ভগবানকে আশ্রয় করে তার ভজনা করেন এবং নিষ্কামকর্মে অনুশীলন করেন, তিনি ভগবানকে লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই অর্জুনের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, ঈশ্বর-অর্পিত মনোবৃত্তি নিয়ে অনাসক্তচিত্তে স্বকর্ম সম্পাদন করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায় : ভক্তিযোগ

অর্জুন গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ থেকে ক্রমে কর্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস, অক্ষর প্রভৃতি যোগর মাধ্যমে ভগবানের অব্যক্ত স্বরূপের সগুণ-নিগুণের বিভিন্ন জ্ঞানের কথা শুনেছেন। দশম অধ্যায়ে ভগবান যে বিশ্বসৃষ্টির মূল উৎস এবং তিনিই যে বিশ্বের তাবৎ ঐশ্বর্যসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত এ তত্ত্ব জানার পর শ্রীভগবানকে বিশ্বরূপবলে প্রত্যক্ষ করেন একাদশ অধ্যায়ে। এখানে ভগবানের দুটি ভাব ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকাশিত। ব্যক্ত স্বরূপের লীলাবতার প্রাণপ্রিয় সখা কৃষ্ণ, অপরটি অচিন্ত্য বিশ্বরূপী পরব্রহ্ম। একটি আরাধনার ধন, ভালোবাসার ধন, অপরটি অনুভবের সম্পদ, বিশ্বব্যাপী অখণ্ড নিরঞ্জন। এই উভয়বিধ স্বরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছে, ভক্তিপথে ভগবানকে আরাধনা এবং জ্ঞানের পথে নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা-এ দুয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর উপযোগী? উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন, ভক্তিপথের সাধকই অভীষ্ট বস্তুকে সহজে লাভ করে থাকেন।

অপরদিকে, অক্ষরব্রহ্ম চিন্তায়ও সাফল্য এসে থাকে। কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মচিন্তা অধিকতর কষ্টকর। অনন্যাভক্তিসহ যে ভক্ত ভগবানের শরণাপন্ন হন, তার উপাসনা করেন, তাকে ভগবান কৃপা করে মৃত্যুরূপ সংসার সাগর হতে উদ্ধার করেন।

ভক্তিপথে ভগবানকে আরাধনায়রত ভক্তের করণীয় বিষয়ে ভগবান বলছেন, সাধককে প্রথমেই চঞ্চল মনকে সংযত করতে হবে। তবে অস্থির চঞ্চল স্বভাবের মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন। এটি দুঃসাধ্য বটে। তবে পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দ্বারা মনকে তার চিন্তার বিষয় হতে প্রত্যাহার করে ভগবৎ-চিন্তায় সমাহিত করতে হবে। এই অভ্যাসে সমর্থ না হলে ভগবদভক্তির উৎপাদক যে সকল কর্ম যেমন সাধু সঙ্গ, ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, ভগবানের লীলাকীর্তনাদি শ্রবণ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি কর্ম করে সাধক সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। তবে কোনো ভক্ত যদি এই শ্রবণ-পূজন-ভজনে অসমর্থ হন, তবে তিনি কর্মের পথে ফলাকাঙ্গাশূন্য কর্ম করেও ভগবৎ অনুগ্রহ পেতে পারেন। মনে রাখা দরকার, ফলাসক্ত চিত্তে ধ্যানধারণা অপেক্ষা ফলাসক্তি বর্জিত কর্ম করাই উত্তম। কারণ ত্যাগ হতেই পরমশান্তিলাভ হয়। সকল বিষয়ের প্রতি জন্মে সমতু বুদ্ধি।

ভক্তের লক্ষণের প্রতি অর্জুনের মাধ্যমে জগজ্জনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান বলছেন, ভগবৎ ভক্ত হবেন অহিংস, সকলের প্রতি থাকবে তার বন্ধুত্ব, দয়া, ক্ষমা; তিনি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে অহংকার বর্জিত হবেন। এমন ভক্তের নিকট শত্রু, মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, শুভ-অশুভ দ্বন্দ্বের অনুভূতি থাকবে না। তিনি হবেন সমত্ববুদ্ধিযুক্ত। ভগবদ্ভক্ত কর্মফলে উদাসীন হয়েও যথাপ্রাপ্ত কর্ম সম্পাদনে হবেন অনলস, গৃহে থেকেও হবেন মমত্ববুদ্ধি বর্জিত। এভাবে প্রিয় ভক্তগণের গুণ ও কার্যাবলি উল্লেখ করে অর্জুনকে এই অমৃততুল্য ভক্তিধর্মের অনুশীলন করতে আহ্বান জানান। তাকে প্রিয় ভক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থেকে স্বধর্মোচিত কর্তব্য সম্পাদনে উৎসাহিত করেন।

এই দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের সগুণ উপাসনার পদ্ধতি এবং ভক্তজীবনের করণীয় বিষয় বর্ণিত হওয়ায় এটিকে ভক্তিযোগ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় :
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

শ্রীমদ্ভগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবানের অব্যক্তস্বরূপ জানার অভিপ্রায়ে অর্জুনের প্রশ্ন হচ্ছে: প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় নিয়ে। তাই এ অধ্যায়ের নাম হয়েছে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ। এখানে উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি কোনো কোনো বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে প্রক্ষিপ্ত, আবার অপর পক্ষের সুধীজনদের বক্তব্য হচ্ছে, এ শ্লোকটি প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে এবং গীতাকে সপ্তশতী বলার পক্ষে অপরিহার্য।

অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে বলছেন। জীবের দেহ হচ্ছে ক্ষেত্র, আর দেহের যে আত্মা সেটি হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ। তবে বিশ্ব চরাচরে। সর্বক্ষেত্রে শ্রীভগবানকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে বুঝতে হবে। আর প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এক কথায়, এটি হচ্ছে। পরমেশ্বরের জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জন করতে সাধককে শাস্ত্র অভ্যাস বা উপদেশ শ্রবণ করতে হয়। এই কর্মের দ্বারা সাধকের তত্ত্বদর্শী জ্ঞানের লক্ষণ তার আচার-আচরণে প্রস্ফুটিত হয়। তিনি হবেন ঈশ্বরের অচলাভক্তির, অধিকারী। সে সঙ্গে তার আচরণে অহংকার শূন্যতা, দম্ভ-হিংসাবর্জিত ভাব, স্নেহমমতা ও আসক্তিহীনতা প্রকাশিত হবে। সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, ধৈর্য এসব হবে তার জীবনচর্চার ভূষণ। তিনি ভক্তজনের সঙ্গে পরমতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করেন। আর সে সঙ্গে গুরুসেবা, আত্মা-পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

আবার জ্ঞেয় বস্তুটি হলো পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম শ্রীভগবানেরই এক পরমসত্তা। তিনি আদি-অন্তহীন। তিনি ইন্দ্রিয়বর্জিত হয়েও অপ্রাকৃত, চিন্ময়, ইন্দ্রিয়শালী-যার ফলে তিনি জগতের সকল বস্তুর মধ্যে কার্যকারিতা হয়ে বিরাজিত। তিনি সর্বময়, সর্বদিকে তার হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ। তিনি আছেন সমগ্র জগৎ জুড়ে। তিনি জীবগণের অন্তরে আছেন আত্মারূপে। বাইরে আছেন জগৎরূপে; স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি নিকটেও তিনি, দূরেও তিনি। সকলের হৃদয়ে তিনি বিরাজমান আত্মা। একাধারে তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য।

পুরুষ-প্রকৃতির বিষয় সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, অনাদি পরব্রহ্ম হতে এদের প্রকাশ। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। তবে এদের আচার-আচরণে পার্থক্য রয়েছে। জগতের প্রকৃতিই হচ্ছে ক্রিয়াশক্তির মূল। আবার পুরুষ নির্লিপ্ত অকর্তা হয়েও প্রকৃতির সংস্পর্শে প্রকৃতির গুণসমূহ ভাগে করে সৎ-অসৎ অর্থাৎ সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। সাংখ্যমতে, পুরুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব। কিন্তু গীতার মতে, পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই মূলতত্ত্ব। আবার দেহস্থিত আত্মাই পুরুষ। যিনি এই পুরষকে পরমাত্মা বলে জানেন তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই পরমাত্মার জ্ঞানলাভের জন্য চারটি সাধনমার্গ রয়েছে। যোগমার্গে ধ্যান-ধারণা-সমাধি ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সাধকের আত্মদর্শন হয়। আবার জ্ঞানমার্গে আত্ম-অনাত্মা বিচারের মধ্য দিয়ে পরমজ্ঞানলাভ হয়। এছাড়া নিষ্কামকর্মযোগ ও ভক্তিযোগের অনুশীলনেও সাধক সদগতি লাভ করেন। গীতায় সাধনপথের ভিন্নতা স্বীকার করা হয়েছে। গীতার এই সমন্বয় চেতনা হিন্দুধর্মে এক উদার ধর্মমতের পরিচয় বহন করছে।

তাই সংক্ষেপে বলা যায়, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে হয় সৃষ্টি। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে পুরুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়তে পারলে পুরুষের পরম-আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। মোটকথা দেহে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বভূতে তিনি পরমাত্মা; জগৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি এক ব্রহ্মসত্যই উপলব্ধি করেন তিনি

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিলাভ করেন।

চতুর্দশ অধ্যায় : গুণত্রয়-বিভাগযোগ

ভাগবত ধর্মের তত্ত্বচিন্তা ক্রমশ প্রকাশ লাভ করছে। পূর্ব অধ্যায়ের প্রান্তে এসে জানা গেছে পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং পুরুষের মুখ্যাবস্থা নির্দেশ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিন গুণের প্রভাব ও কার্যাবলি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে গুণত্রয়-বিভাগযোগ। পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, এই চরাচর জগৎ-প্রকৃতিরই পরিণাম। তবে প্রকৃতি নিজে সৃষ্টিক্ষম নয়। পুরুষের সৃষ্টির সংকল্পই প্রকৃতিতে সৃষ্টিশক্তি, জননশক্তির উদ্ভব ঘটায়। এভাবে সৃষ্টিক্রিয়া চলতে থাকে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব তথা জাগতিক পিতা-মাতা ও সন্তানের বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। পুরুষ পিতা হিসেবে প্রকৃতিতে গর্ভসঞ্চার করে। তবে এই গর্ভাধান পুরুষের দৃষ্টিপাতে, ঈক্ষণে বা সংকল্পে হয়ে থাকে। পিতার নিকট থেকে সন্তান পেয়েছে অনুচৈতন্য, আবার মাতার নিকট থেকে পেয়েছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। মায়ের দেয়া গুণ তিনটি পিতার দেয়া চৈতন্যকে আবৃত করে রাখে। চৈতন্যকে পরম চৈতন্যের কাছে যেতে দেয় না। পরম চৈতন্যকে লাভ করতে হলে গুণ তিনটিকে অতিক্রম করতে হবে।

গুণ তিনটির পরিচয়ে বলা হয়েছে, সত্ত্বগুণ নির্মল প্রকাশ্যরূপ। তবে মিশ্র সত্ত্বগুণের প্রকাশ ঘটে সুখ ও জ্ঞানে। ফলে মিশ্র সত্ত্বগুণের সাধকের অনুভূতিতে আসে "আমি সুখী, আমি জ্ঞানী-এ রকম অভিমান।" রজোগুণের ধর্ম অন্যবস্তুকে বা ভাগ্যেবস্তুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা। এর ফলে মানুষ বিবিধ কর্মে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং পরিণামে দুঃখাক্রান্ত হয়। আবার তমোগুণে আসে মোহ-অজ্ঞানতা।

এর প্রকাশ ঘটে প্রমাদ, আলস্য, নিন্দা-প্রিয়তার মধ্যে। তবে এখানে উল্লেখ্য, এই গুণ তিনটি পৃথক পৃথকভাবে থাকে না। একটি অপর দুটির উপর প্রাধান্য সৃষ্টি করে স্বীয়ভাবে খানিকটা প্রকাশ করে থাকে।

এই গুণত্রয়ের লক্ষণ আরেকটু বিস্তৃতভাবে বলা যেতে পারে। সত্ত্বগুণ প্রবল হলে দেহের ইন্দ্রিয়গুলোতে নির্মল জ্ঞানলাভের প্রয়াস উৎপন্ন হয়। আবার রজোগুণ। যখন বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের মনে বিষয়াসক্তি, কর্মপ্রবৃত্তি, অস্থিরতা দেখা দেয়। এছাড়া আলস্য, বিস্মৃতি, বুদ্ধিলাপে-এসবের মধ্য দিয়ে তমোগুণের প্রকাশ হয়ে থাকে। আবার ফলের দিক দিয়েও এ তিনগুণের অবদান ভিন্ন ভিন্ন। জীব সুখলাভ করে সাত্ত্বিক কর্মে, দুঃখ পায় রাজসিক কর্মে, আর অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত হয় তামসিক কর্মে। এছাড়া জীবের মৃত্যুর সময়ে যার সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে তিনি স্বর্গলাকে প্রাপ্ত হন। রজোগুণ প্রভাবিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর মানবদেহেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে তমোগুণ আচ্ছন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর পশুজন্মে নিপতিত হয়। সাত্ত্বিকগুণের প্রভাবে মানুষ স্বর্গ পর্যন্ত লাভ করতে পারে, কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য চাই গুণ তিনটিকেই অতিক্রম করা।

গুণাতীত হওয়ার উপায় হিসেবে বলা হয়েছে, সাধক গুণসমূহের প্রভাব হতে মুক্ত থাকবেন। তিনি উদাসীনের ন্যায় জীবনযাপন করবেন। জাগতিক সুখ-দুঃখে বিচলিত হবেন না, নিন্দা-প্রশংসায় তুষ্ট বা রুষ্টও হবেন না, চিত্তকে সাম্য অবস্থায় রাখবেন। তবে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত গুণাতীত ব্যক্তি ভক্তিযোগ সহকারে অনন্য ভক্তিতে ভগবানকে স্মরণ, মনন, সেবন, পূজন প্রভৃতি কর্মের দ্বারা সকলগুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভাবলাভ করতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মভাব, শাশ্বত ধর্ম, ঐকান্তিক সুখ-এসবের একমাত্র আশ্রয় হলেন ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায় : পুরুষোত্তমযোগ

চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখা গেছে সর্বেশ্বর তথা পুরুষোত্তমর ভজনার মধ্য দিয়ে মানুষ ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মভাবলাভ করতে পারে। সেই পুরুষোত্তম তত্ত্বটি আরো বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অবতারণা। আর এজন্যই এ অধ্যায়ের নাম হয়েছে পুরুষোত্তমযোগ। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ত্রিগুণাতীত সাধক কীভাবে সংসার বন্ধন অতিক্রম করে ব্রহ্মভাবলাভ করতে পারে। সাধনার এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের শুরুতে সংসার কী? এর মূল কোথায়? জীবের জন্ম ও মোক্ষলাভ কীভাবে সম্ভব? ইত্যাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান পুরুষোত্তমের পরিচয় ও তাঁর পরমতত্ত্ব এখানে আলোচিত হয়েছে।

জগৎ সংসারকে অশ্বত্থ-বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাধারণত বৃক্ষের মূল থাকে নিচে, আর তার শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটে ঊর্ধ্বদিকে। কিন্তু সংসার বৃক্ষ এর বিপরীত। মূল ঊর্ধ্বে, শাখা-প্রশাখার বিস্তার নিম্নদিকে। এ বৃক্ষের মূলে রয়েছেন পরমব্রহ্ম। বেদসমূহ এ বৃক্ষের পত্রস্বরূপ । আবার বিষয় আসক্তি এ বৃক্ষের অবান্তর মূলসমূহ। মায়াবদ্ধ জীব এ বৃক্ষের স্বরূপ জানে না। ফলে সংসারচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বৃক্ষমূলে অবস্থিত ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে ত্যাগ ও বৈরাগ্য অনুশীলন করে পরমপদে অন্বেষণ করতে হবে। অভিমান, আসক্তি, কামনা, বাসনা মুক্ত হয়ে সাধক পরমপদ লাভে যত্নবান হবেন। এভাবে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে সাধককে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না।

জীবের পরিচয় দিতে গিয়ে ভগবান বলছেন, জীব তাঁরই সনাতন অংশ। তবে পরমতত্ত্ব না জেনে জীব সুখ-দুঃখভাগে করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্ব জানে না। কিন্তু আত্মজ্ঞ ভক্তগণ এটি জেনে থাকেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণের কারণ। সৃষ্ট জগতের সবকিছু তাঁরই সত্তায় সত্তাবান। তারই শক্তিতে শক্তিমান। ভগবান স্বয়ং স্রষ্টা হয়ে জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। তিনি রয়েছেন ওষধিসমূহে, জীবদেহে, জঠরাগ্নিরূপে, অন্তর্যামীরূপে। তাঁরই গুণমহিমা প্রকাশিত হয়েছে বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রসমূহে।

পুরুষোত্তম আপন পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলেছেন, তিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয় পুরুষেরই অতীত। তিনিই পুরুষোত্তম। যে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তমরূপে জানতে পারেন তিনি হয়ে যান সর্বজ্ঞ। কিছুই তার জানার বাকি

থাকে না। তিনি বুঝতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণই নির্গুণ-সগুণ অবতার, তিনিই আত্মা। তবে এই পুরুষোত্তম তত্ত্বটি অত্যন্ত রহস্যময়, যাকে বলা হয় গুহ্যতম, এটা জেনে সাধক কৃতার্থ হন এবং সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজন আনন্দে নিবেদিত থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায় : দৈবাসুর-সম্পদবিভাগ যোগ

ভগবৎ স্বভাবের গুহ্যতম কথা জেনে সাধক কৃতার্থ হন, ঈশ্বর অনুগ্রহলোভ ধন্য হন। একথা দিয়ে পূর্ববর্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপসংহার টানা হয়েছে। জগৎ সংসারে মানবকুলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে দৈবী প্রকৃতি ও আসুরী প্রকৃতি। যারা দৈবী প্রকৃতির, তারা ভগবৎ কৃপা পাওয়ার যোগ্য। অপরদিকে, আসুরী প্রকৃতির জনগণ ঈশ্বরকৃপা হতে বঞ্চিত। এই ষোড়শ অধ্যায়ে চব্বিশটি মন্ত্রে দৈবী

সম্পদ এবং আসুরী সম্পদের বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় একে বলা হয়েছে দৈবাসুর-সম্পদবিভাগ যোগ।

এখানে দৈবী সম্পদশালী সাধকের যেসকল গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর পরিচয় পূর্ব বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত, জ্ঞানী ও গুণাতীত ব্যক্তির মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে। দৈবী সম্পদের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে এ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে। নির্ভীকভাব, চিত্তের পবিত্রতা; আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুণগুলো অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। অর্জুন দৈবী সম্পদ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং, দৈবী সম্পদের গুণেই তিনি সকল শোক-মোহের উর্ধ্বে অবস্থান করবেন।

অপরদিকে, আসুরী প্রকৃতির লোকেদের স্বভাবে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতার প্রকাশ ঘটে থাকে। এসকল গুণের প্রভাবে মানুষ ধর্মাধর্ম, কর্তব্য, অকর্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। তাদের আচার-আচরণে শুচিতা, সংযম, সদাচার থাকে না। তারা জগতের সত্য, ধর্ম, শাস্ত্র এমনকি ঈশ্বরকেও মানে না। এসকল বিকৃতমতি নিষ্ঠুর কর্মা ব্যক্তিগণ অসুর স্বভাব নিয়ে জগতের অকল্যাণ করে থাকে। কাম্যবস্তু উপভোগেই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগের সামগ্রী যতই পায় ততই তাদের ভাগের বাসনা বিস্তারলাভ করে। আর ভাগ্যেবস্তুলাভের জন্য মানবতা-সদাচার বিরাধী জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এরা দম্ভ করে বলে: আমি প্রভু, আমি ধনী, আমি মানী, আমি ধর্ম-কর্ম করি, দান করি, আমিই সব করি, আমিই ঈশ্বর। এই অহংকারী আসুর প্রকৃতির লোকে বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে জগতের অকল্যাণ করে থাকে। পরিণতিতে এই আসুর প্রকৃতির লোকে পুনর্জন্মে আসুর যোনিতে জন্ম নেয় এবং ক্রমশ অধোগতিলাভ করে। আসুর প্রকৃতির লোকগণ ঈশ্বর বিমুখ হওয়ায় ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভে হয় বঞ্চিত। আর তাদের অধোগতির শেষ স্তরে তারা নরকবাসী হয়। এই নরকে পতিত হওয়ার তিনটি পথ-কাম, ক্রোধ ও লোভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাম-ক্রোধ রজোগুণজাত। এদের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র। এর যেকোনো একটিকে অনুসরণ করলেই অপরটিও এসে পড়ে এবং ঐ ব্যক্তিকে নরকের দিকে নিয়ে যায়। এসঙ্গে লোভকেও দেখে নেয়া যায়। ভাগ্যেবস্তু লাভের যে বাসনা সেটাই লোভ। লোভের বশে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কাম-ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়ে এবং পরিণামে নরকে পতিত হয়। নরক বাস কারো অভিপ্রেত নয়। কাজেই এখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিকে ত্যাগ করতে পারলেই উন্নত স্বভাবের অধিকারী হয়ে কল্যাণলাভ করতে পারা যায়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কাম, ক্রোধ, লোভ কেমন করে জয় করা যায়। সে পথেরই সন্ধান দিয়ে এখানে বলা হয়েছে, সমাজের হিতসাধন ও নিজের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র জ্ঞানকে আশ্রয় করতে হবে। শাস্ত্র নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মানুষ জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণের পথ লাভ করতে পারে। ব্যক্তিজীবনে ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে শাস্ত্রকেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। আর শাস্ত্রবিহিত কর্ম সকলেরই করণীয় হওয়া উচিত।

সপ্তদশ অধ্যায় : শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ

শাস্ত্রবিধি অনুসরণে জীবের কল্যাণ-এ বক্তব্য নিয়ে শেষ হয়েছে ষোড়শ অধ্যায়। একথারই সূত্র ধরে অর্জুনের প্রশ্ন কার্যাকার্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই যখন প্রমাণ, তখন সমাজের বেশ কিছু লোক আছেন যারা শাস্ত্রবিধি মেনে চলেন না, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজা-অর্চনাদি করে থাকেন। এরূপ ব্যক্তিদের নিষ্ঠা কী রূপসাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক? অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাত্রয়ের কথা বিশ্লেষণ করেছেন, আর এজন্যই এ অধ্যায়ের নাম হয়েছে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ।

ভগবান শ্রদ্ধাত্রয়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষের শ্রদ্ধা স্বভাবজাত, অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কারলব্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপ সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার শ্রদ্ধাও সে রকমই হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণগুলোর প্রভাবেই মানুষের স্বভাব যেমন তিন রকমের হয়, তাদের শ্রদ্ধাও অনুরূপ তিন রকমের হয়ে থাকে। তাদের ধর্মকর্মের অনুশীলনের মধ্যেও পার্থক্য। দেখা যায় সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি দেব-দেবীর অর্চনা করেন। রাজসিক প্রকৃতির লোক যক্ষরক্ষাদির অর্চনা করেন, আবার তামসিক প্রকৃতির লোক যারা, তারা করে ভূত-প্রেতের পূজা। এখানে উল্লেখ্য, শাস্ত্রজ্ঞানে পরিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে যদি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা মার্জিত হয় তবে সেটি নির্মল ও বিশুদ্ধ হয়ে একমাত্র ঈশ্বরেই অর্পিত হয়ে থাকে।

মানুষের শ্রদ্ধার ন্যায় আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও তিন রকমের হয়ে থাকে। অপরের কল্যাণার্থে কর্মই যজ্ঞ। যজ্ঞ করা কর্তব্য, এ জন্যই যজ্ঞ করা-এরূপ কর্তব্যবুদ্ধিতে সম্পাদিত যজ্ঞই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। অপরদিকে, দম্ভবশত নিজ গৌরব দেখাবার জন্য যে যজ্ঞ তাকে বলে রাজসিক যজ্ঞ। এছাড়া আচার-নিষ্ঠাহীন অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্মকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

জীবের তপস্যাও রয়েছে তিন প্রকারের। যে তপস্যায় গভীর শ্রদ্ধা থাকে, ঈশ্বরে থাকে একান্ত অনুরক্তি তাকে বলে সাত্ত্বিক তপস্যা। মান, পূজা ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভের জন্য যে তপস্যা তাকে বলে রাজসিক তপস্যা। আবার অপরের ক্ষতিসাধন করার জন্য সৎ-অসৎ জ্ঞানহীন হয়ে নিজ দেহকে কষ্ট দিয়ে যে তপস্যা তাকে বলে তামসিক তপস্যা।

প্রসঙ্গত, দানকর্মকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কোনো ফল কামনা না করে দান করা কর্তব্য-এরূপ বুদ্ধিতে সম্পাদিত দানই সাত্ত্বিক দান। প্রতিদানের আশায় বা স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে যে দান সেটিকে বলে রাজসিক দান। এছাড়া যে দান অনুপযুক্ত স্থানে, কালে ও পাত্রে দেয়া হয় তাকে বলে তামসিক দান। অনুরূপভাবে দৈনন্দিন জীবনের আহার্য বস্তুকেও তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। অধ্যায়ের শেষের দিকে কর্মে ব্রহ্ম নির্দেশের কথা; বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলকে রক্ষার জন্য যজ্ঞাদি কর্মেরও সৃষ্টি করেছেন। বুঝতে হবে পরব্রহ্মই সকল সৃষ্টির মূল। 'ওঁ তৎ সৎ' ব্রহ্মবাচক সংকল্পের প্রয়াগে বিষয়েও বলা হয়েছে, যজ্ঞদান-তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মই ব্রহ্মবাচক শব্দ 'ওঁ এটি উচ্চারণ করে সম্পন্ন করা কর্তব্য। আবার মুক্তিকামী সাধক যে নিষ্কামকর্ম করবেন সেখানে তিনি ব্রহ্মবাচক 'তৎ' এটি প্রয়োগে করবেন। এছাড়া সমাজজীবনের বিবাহাদি পবিত্র শুভকর্মে 'সৎ' শব্দ প্রয়াগে করার বিধান রয়েছে।

শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা সম্পাদনের প্রাণ হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার সাথে ধর্মকর্ম সম্পাদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তবেই এসকল কর্মে কল্যাণকর শুভফল উৎপন্ন হবে। অপরদিকে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় যজ্ঞদানাদি যে কর্মই সম্পন্ন হোক, তা হবে অসৎ কর্ম। আর এ অসৎ কর্ম ইহকালে কি পরকালে কোথায়ও শুভফল প্রদান করবে না। অতএব, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে কর্ম করাই বিধেয়।

অষ্টাদশ অধ্যায় : মাক্ষযোগ

অর্জুনের বিষাদ দিয়ে শুরু এই গীতাগ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে কর্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলাচেনার মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করেছেন। সতেরটি অধ্যায়ে মাঝে মাঝে অর্জুন প্রশ্ন করে করে তাঁর সংশয় দূর করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিঃসংশয় হতে পারছেন না। তাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুনের মনের গভীরস্তরে আলোড়িত কর্ম ও সন্ন্যাস-এর কোনটি তাঁর অনুসরণীয় এটি নিশ্চিত করে জানার আকাক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। প্রশ্নোত্তরে ভগবান কর্মযোগ ও সন্ন্যাস এবং গীতাগ্রন্থে আলাচেিত পূর্ব-বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ নির্দেশ করে জীবের মোক্ষলাভের উপায় পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর এ জন্যই এ অধ্যায়কে মোক্ষযোগ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করে সাধক মুক্তিলাভ করে থাকেন। আবার যারা সন্ন্যাস মানে কর্মত্যাগের কথা বলেন, সেক্ষেত্রে শ্রীভগবানের উত্তর হচ্ছে কর্মত্যাগ নয়, কর্মফলভোগের বাসনাত্যাগ। আর এরূপ ত্যাগী ব্যক্তি যথার্থ সন্ন্যাসী। এই ত্যাগ প্রসঙ্গে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৈচিত্র্যময় প্রভাব বর্ণনা করেছেন। এর ফলে চলে এসেছে সাত্ত্বিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ ও তামসিক ত্যাগের কথা। অনুরূপভাবে এসেছে তপস্যার কথা, আহারের কথা, জ্ঞানের কথা, দানের কথা, বুদ্ধি, ধৃতির কথা। মানুষের সুখও তিন রকমের হয়ে থাকে। যে সুখে ক্রমে ক্রমে আনন্দানুভূতি গভীর হতে থাকে সেটি সাত্ত্বিক সুখ। আবার যে সুখের শুরুতে থাকে আনন্দ, পরে বিষাদ এমন সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয়। এছাড়া মোহবশত নিদ্রা ও আলস্যজনিত কর্মে যে সুখ অন্বেষণ তা তামসিক সুখ। এভাবে গুণত্রয়ের প্রভাবমুক্ত হয়ে সাধক ক্রমে ভগবৎ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। প্রসঙ্গত চাতুর্বর্ণ ও তাদের স্বভাব কর্মের কথাও উল্লিখিত হয়েছে এখানে। কথা সংক্ষেপ করে ভগবান বলেছেন, জীব স্ব-ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না। তার অন্তঃস্থিত ঈশ্বরই তাকে যন্ত্রের মতো পরিচালিত করেন। সেই অন্তর্যামী ভগবানের শরণাপন্ন হলে জীব শান্তিলাভ করতে পারে। অর্জুনকে লক্ষ্য করে জগজ্জনের উদ্দেশ্যে ভগবানের অভয়বাণী হচ্ছে একান্তভাবে ভগবানে শরণাপন্ন হলে ভগবানই তাকে শোক, তাপ, দুঃখ থেকে উদ্ধার করে মোক্ষদান করেন। ভগবানের এই অভয়বাণী শ্রবণ করে অর্জুনের মোহ দূর হয়েছে। এখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী হচ্ছেন। গীতার শুরুতেই ছিলো রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন। তার প্রশ্নোত্তরেই সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন শ্রবণ করে আনন্দিত হয়েছেন, পুলকিত হয়েছেন এবং নিজেকে ভগবান মনে করছেন। দিব্যদৃষ্টি ও জ্ঞানে গীতা শ্রবণ করে সঞ্জয়ের মন্তব্য হচ্ছে যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্ধর পার্থ, ধ্রুবানীতি রয়েছে, সেখানে বিজয় সুনিশ্চিত। এখানেই গীতা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

উৎসবের দুর্গাপূজা

চিররঞ্জন সরকার

বাঙালি হিন্দুর সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আজ ৯ অক্টোবর মহাষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা শুরু হচ্ছে। ১৩ অক্টোবর মহাদশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

শারদীয় দুর্গোৎসবকে অকাল বোধন বলা হয়। অর্থাৎ অকালে দেবীদুর্গাকে জাগানো হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে, পুরো বছরকে উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন এই দুটি কালে ভাগ করা হয়। মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত উত্তরায়ন এবং শ্রাবণ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত সময়কে দক্ষিণায়ন কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উত্তরায়ন কালে দেবদেবীদের জাগ্রত কাল এবং দক্ষিণায়ন দেবদেবীর নিদ্রাকাল। রামচন্দ্র যুদ্ধের প্রয়োজনে অকালে দেবীকে বোধন অর্থাৎ স্তব-স্তুতির মাধ্যমে জাগরণ ঘটিয়ে দুর্গাপূজা করেছিলেন। এ কারণে শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকাল বোধন বলা হয়। দেখা যায় দেবীকে নিদ্রা থেকে জাগানোর জন্য বেলতলায় মহাদেবের স্তবকের অনুমতি নিয়ে বোধন ঘটাতে হয়।

আমরা দুর্গাপূজা বললেও আসলে এই পূজা কেবল দুর্গার একার নয়। সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন। দুর্গা আসেন সবাইকে নিয়েই? ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, গাছ-প্রাণী সঙ্গে নিয়েই। চালচিত্রে শিব আছেন, তো পায়ের নিচে অসুর। কলাগাছ বউ তো পেঁচা, হাঁস, ইঁদুর, ময়ূর বাহন। হাসিকান্না, সুজন-দুর্জন, পশুপক্ষী-উদ্ভিদ সমাহারে আমাদের জীবনপথ চলাটাকেই সহজ করে চিনিয়ে দিতে চান। দেবদেবী মানুষের কল্পনামাত্র। নিজের কল্যাণ কামনায় এবং অপশক্তি বধে মানুষ যুগে যুগে নানা দেবদেবীর কল্পনা করেছে। এই কল্পনার রূপটিই ধরা পড়ে দুর্গাপরিবারের চিত্র দেখলে। দুর্গাপরিবারের চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, মা দুর্গা মহিষাসুরের সঙ্গে ধুন্ধুমার লড়াই করছেন, অথচ তার ছেলেমেয়েরা নিতান্ত উদাসীনভাবে পাশে দাঁড়িয়ে। সুদর্শন কার্তিক তার অস্ত্র তোলেন না, গণেশের মুখে তো একটা হাসির আভাস, লক্ষ্মী নিজের ঝাঁপিটা আরও শক্ত করে চেপে ধরেন, সরস্বতীও বীণা হাতে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকেন। এই অ দ্ভুত দৃশ্যের অর্থ বুঝতে ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হবে।

দুর্গা সম্পর্কে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বিবরণ পাই গুপ্তযুগের পরে। বাংলায় আর একটু পর থেকেই দেবীর নানান রূপ সম্পর্কে লেখা ও ভাস্কর্য আসতে শুরু করে, কিন্তু আজকের এই প্রতিমার রূপটিতে পৌঁছতে আরও কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাসী রামায়ণে যুদ্ধরতা দেবী এবং রামচন্দ্রের অকালবোধন সম্পর্কে প্রচলিত নানান লোককাহিনিকে প্রথম একসূত্রে গাঁথা হলো, তৈরি হলো তার প্রথম নির্দিষ্ট বিবরণ, যাকে আগমার্কা বাঙালি কাহিনি বলতে পারি।

আশ্বিন-কার্তিকে দুর্গাপূজার ব্যাপারটা একেবারেই এই অঞ্চলের কৃষির সঙ্গে জড়িত। এখানে আমন ধান আসার অনেক আগে থেকে আউশ ধানের প্রচলন ছিল, সেই ধান পাকার সময়েই এই পূজা। মহিষের ব্যাপারটা সম্পর্কে প্রচলিত মতো হলো, এই প্রাণীটি নিচু জমিতে বাস করত, এই অঞ্চলে চাষের প্রসারের জন্য কৃষিজীবী মানুষ ক্রমেই মোষ তাড়িয়ে মেরে জমি দখল করে। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আরাধনা হয়তো এই মহিষ নির্মূল অভিযানকে একটা ধর্মীয় বৈধতা দেওয়ার কৌশল ছিল, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা কংসনারায়ণের মতো জমিদারদের পক্ষে, যাদের সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষির প্রসার।

রমাপ্রসাদ চন্দ এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলছেন, সিংহবাহিনী দুর্গাকে গুপ্তযুগের পরে বাংলায় বাইরে থেকে আমদানি করা হয়, কিন্তু অন্যদের মতে এই অঞ্চলেই তার উৎপত্তি। এক অর্থে দুটো মতোই ঠিক, কারণ এই দুর্গার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আবার বহিরাগত উপকরণও আছে। কিছু কিছু দুর্গামূর্তিতে দেখা যায়, সিংহের বদলে দুর্গার বাহন হলো গোধিকা বা গোসাপের মতো একটি প্রাণী, কালকেতুর কাহিনিতে যার কথা আছে। লক্ষণীয়, গোসাপ অনেক বেশি প্রাকৃত, সিংহ সে তুলনায় সংস্কৃত প্রাণী। উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার পটুয়া ও চিত্রকররা সিংহটাকে ঠিক বাগে আনতে পারতেন না, কারণ তারা তো জীবনে এই প্রাণীটিকে দেখেননি। উত্তর ভারতে আবার দেবী এখনও রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পিঠে, 'শেরাবালি'। মজার ব্যাপার বটে।

পৌরাণিক কাহিনি থেকে দুর্গা পূজার শুরু। কিন্তু ক্রমে দুর্গা যেন বাঙালির ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছে। সাধারণ মেয়ে, তবে দাপুটে। এই দাপুটে মেয়ের কত নাম! এক অঙ্গে বহুরূপ। এক রূপে বহু নামে চিহ্নিত আমাদের মা দুর্গা। শরৎ ঋতুতে আবাহন হয় বলে দেবীর আরেক নাম শারদীয়া। এছাড়া মহিষাসুরমর্দিণী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, ঊমা, গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্রিজা এমন কত নাম আছে মায়ের। ঠিক নানি-দাদিরা যেমন আমাদের আদর করে একটা নামে ডাকে, মামারবাড়িতে আদিখ্যেতা করে অন্য নামে ডাকা হয়। আবার বাবার দেওয়া একটা নাম, মায়ের দেওয়া একটা নাম, স্কুলের জন্য একটা ভালো নাম। মা দুর্গারও তেমনি অনেক নাম। সে তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে!

যদিও আমাদের ঘরের মেয়ে বা লৌকিক দুর্গার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনির তেমন কোনো মিল নেই। লৌকিক দুর্গা বাঙালির ঘরের মেয়ে, চলতি তথাকথিত মেয়েলি সব বৈশিষ্ট্য তার অধিকার। মাকে যেমন

একাহাতে অনেক কাজ করতে হয়, ঠিক যেমন মাদুর্গাকে দশহাতে যুদ্ধ করতে হয়েছিল মহিষাসুর বধের সময়। সব দেবতা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল মাদুর্গাকে। অনেকগুলো দৈত্য, দানব, অসুরকে তিনি মেরেছিলেন। আমরা শুধু মহিষাসুরের নামটাই জানি। রক্তবীজ, চ-, মু-, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ধূম্রলোচন, মধু, কৈটভ আর মহিষাসুর, মোট ন'জন অসুরকে মা দুর্গা বধ করেছিলেন।

আমরা যেমন ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান, আত্মীয়-পরিজন ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না, আমরা দুর্গার ক্ষেত্রেও তাই দেখতে চেয়েছি। লৌকিক দুর্গা আমাদের মাঝে দেখা দেন সপরিবারে। বাঙালির আপন মনের মাধুরী মেশানো দুর্গা তার সন্তান কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাস থেকে হিমালয়ের ঘরে বাপের বাড়ি আসেন। বাঙালির ঘরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার মতো আনন্দ। যেমন- পরিবারে সবাই আপন, সে রকম জগজ্জননীর বিশ্বসংসারে আমরা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ, ব্যবসায়ী বৈশ্য, শাসনকর্তা- সবাই বিশ্বজননীর সন্তান সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশের মতো সবাই আপন। সন্তানদের কল্যাণের জন্য মা দুর্গা সর্বদাই উদগ্রীব। তাই ১০ দিক থেকে সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ১০ হাতে ১০ অস্ত্র ধরেছেন।

তবে বাঙালি যেভাবে দুর্গাপূজাকে আত্মস্থ তথা জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তেমনভাবে আর কেউ করতে পারেনি। মাতৃরূপে বা শক্তিরূপে মা দুর্গা যেমন বাঙালির অন্তরজুড়ে বিরাজ করছেন, তেমনি কন্যারূপে উমা বাঙালির সংসারে এক অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার করেছে। কথিত আছে, গিরিরাজ হিমালয় ও তার স্ত্রী মেনকা কন্যা উমা বা পার্বতীকে বিয়ের পর কৈলাসে শিবের ঘরে পাঠিয়েছিলেন। বৎসারান্তরে সেই কন্যাকে দেখার জন্য মা মেনকার ব্যাকুল প্রার্থনা যেন প্রতিটি বাঙালি পরিবারের সর্বজনীন প্রার্থনায় পরিণত। ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে- তাই বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখা দেয় আনন্দের শিহরণ। আমাদের এই দুঃখ-দৈন্যের ঘরে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আসবে মাত্র চার দিনের জন্য, তাই সব দুঃখ ভুলে ঘরে ঘরে আনন্দের পসরা সাজায়, নতুন জামাকাপড় পরে দুখকে বিদায় দিয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস। এভাবে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করার ঘটনা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মা দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বাঙালির আগমনী সংগীত আমাদের জীবনপ্রবাহে মিশে যাওয়া এক অবিচ্ছেদ্য ধারা। এর তাৎপর্য হৃদয় দিয়ে, গভীর বোধ দিয়ে অনুভব করতে হয়। ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাসের বাইরের এ বোধ। এটাই চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ।

সবাই মিলে নিরুপদ্রপে ইচ্ছেমতো পূজার আনন্দে শামিল হতে পারলে উৎসব তার প্রকৃত তাৎপর্য ফিরে পাবে। আর এখান থেকেই নতুন করে আগামী এক বছর চলার শক্তি ও পাথেয় সংগ্রহ করে মানুষ আবার নতুন করে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। সংসারের সব অসুরকে হারিয়ে নতুন এক উজ্জ্বল, উচ্ছল জীবনবোধে উদ্বেল হয়ে শুরু হবে নতুন করে পথচলা।

এটাই দুর্গাপূজার মূল তাৎপর্য!

সংগৃহীত
লেখক: কলাম লেখক

মহালয়ার মহাতত্ত্ব

রনজিৎ মোদক

মহালয় থেকে এসেছে মহালয়া। পিতৃপক্ষ এবং দেবী পক্ষের সন্ধিক্ষণ হচ্ছে মহালয়া। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা। এ সময় কে পিতৃপক্ষ বলা হয়েছে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ হয়ে দেবী পক্ষের শুরু হয়। শুক্লা প্রতিপদ থেকে কোজাগরি পূর্নিমা পর্যন্ত হচ্ছে দেবী পক্ষ। মহালয়ায় পিতৃ তর্পণ করা হলে পিতৃ পুরুষ খুশী হয়ে আর্শিবাদ করেন। ধন জন ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। মাতৃ পূজার সন্ধিক্ষণে ব্রহ্মার নির্দেশে পিতৃ পুরুষ মনুষ্য লোকের কাছাকাছি চলে আসেন। গোটা পক্ষকাল ধরে পিতৃ পুরুষের স্বরণ ও মননের মাধ্যমে তর্পণ করা হয়। এ সময় তর্পণ করতে না পারলে তারা দীপাবলির দিনও করতে পারেন। পিতৃ পুরুষের আত্মার প্রতি পিন্ডদান ও জল উৎসর্গ করা প্রয়োজন। বিষ্ণুকে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ সেবন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। অবতার পুরুষ শ্রী রাম চন্দ্র তাঁর পিতা দশরথের মুক্তি জন্য যজ্ঞ তর্পণ করেন। পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের মধ্যে পিন্ডদান বিধেয়। যে পুত্র তার পিতৃ পুরুষের জন্য পিন্ডদান করেন না। সেই সংসারে নানা বিধ অমঙ্গল নেমে আসে।

জন্মান্তর ও কর্মবাদ গ্রন্থে উল্লেখ, দুজন পাপী বহু বছর যাবত নরক ভোগ করতে ছিলো। নারদমুনি বিষ্ণুর কথা মতো মর্তধামে এসে তাদের এক মাত্র কন্যা কে খুঁজে পান। সেই কন্যা বারবনীতার গৃহে অবস্থান করছে। সাধু বেশে নারদমুনি সেই মেয়ের নিকট তার পিতা মাতার উদ্দেশ্যে দান চাইলেন। পিতা মাতার কথা শুনে সেই মেয়ে রেগে বললেন আমাকে জন্ম দিয়ে তারা মারা গেছে। জন্মই আমার অপরাধ তাদের নাম আমার কাছে বলোনা। এভাবে সাধুকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এক দিন নদীর ঘাটে স্নান কালে সাধু সেই মেয়েকে বললেন, মা তোমার বাবা মার উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জলই দাও। সাধুর কথায় সেই পতিতা মেয়ে তিন অঞ্জলি জল নদীর তীরে ফিকে দেয়। সেই নদীর ঘাটে জল সেবার জন্য কয়েক হাজার পিপিলিকা অপেক্ষা করছিল। সেই পিপিলিকা জল পান করে তারা সেখান থেকে চলে যায়। এতে সেই পাপীদ্বয় নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেয়ে বিষ্ণু পদে লগ্ন হয়ে যায়।

পিতৃ পুরুষেরা অনেকেই অনেক সময় নানা রকম কর্মের ফলে পাপ ভোগ করেন। কেউ কেউ জড় দেহ পর্যন্ত ধারণ করতে পারেন না। সুক্ষদেহে প্রেতাত্মা রূপে থাকতে বাধ্য হয়। বংশের কেউ যদি তার পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে ভগবান প্রমাদ উৎসর্গ করে পিন্ডদান করেন। তখন আত্মার ভুতের দেহ দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তি হয়ে শান্তি লাভ করেন।

যারা ভক্তি যোগের সাধন করেন তাদের এই অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন নেই। শ্রীমদ ভাগবতে (৭-১০-১৮) প্রহ্লাদ নৃসিংহ লীলায় ভগবান নৃসিংহদেব ভক্ত প্রহ্লাদের একুশ কূল উদ্ধার করেন। ভক্ত ভগবানের কাছে কিছু না চাইতেই ভগবান ভক্তকে তা দান করেন। ভক্তদের পিন্ডদান ও তর্পণ ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই তবুও তাঁরা এ কাজ করেন, সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করে জড় জগতে সাধারণ মানুষের মতো লীলা করে ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার দেহ ত্যাগের পর গয়াধামে গিয়ে পিন্ডদান ও তর্পন করে ছিলেন। যদি কোন ব্যাক্তি যথাবিধি পিন্ডদান ও তর্পণ অক্ষম হন তবে তার জন্য মহালয়ার পিতৃপক্ষের সুযোগ শাস্ত্রে প্রদান রয়েছে। তবে জেনে রাখা ভালো মহলয়ার দিনই পিতৃপক্ষের শেষ দিন। এ সময় যদি কেউ কোন কারণ বসত পিন্ডদান বা তর্পন করতে না পারেন তবে দীপাবলিতে পিতৃ পুরুষের পিন্ডদানে ও তর্পন করতে পারবেন।

মহামায়া যোগমায়াই হচ্ছে মহাদেবী দুর্গা। তিনি শুধু অসুরবধের সময় মুহাশক্তি চন্ডী রূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় মধুকৈটভ কে বধ করেন। ক্রেতা যুগে রাবন বধের জন্য রাম অকাল, বোধন করেন। মহালয়ার দেবীর মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। বেল গাছ তলায় ষষ্ঠী তিথি পর্যন্ত ঘটের মাধ্যমে পূজা হয়। শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ছয় মাস দক্ষিণায় দেব লোকে রাত্রি দেবগন এ সময় নিদ্রিত থাকেন। কৃত্তিবাস রামায়ণে বর্ণিত ঘটনায় অকাল বোধন উল্লেখ রয়েছে।

মহাদেবী কে যারা মহামায়া রূপে পূজা করেন তারা মায়ার জগতে ধন ঐশ্বর্যে, মায়া মমতায় জড়িয়ে পরেন। গীতায় অর্জুন বিষাদ যোগে, অর্জুন যুদ্ধ করতে কুরুক্ষেত্রে উপনিত হয়ে ও তিনি মহামায়ার প্রভাবে প্রভাভিত হয়ে ছিলেন এবং স্বজন বধ করে মহা পাপ গ্রহন করতে চাননি। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্ম নিবেদন করে তাঁর কৃপায় মহামায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হন। অর্জুন যোগমায়া যোগেশ্বরীর শ্রীপদে কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাচ্ছন্ন না হয়ে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম সাধনে এগিয়ে আসাই মনুষ্য জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। অজ্ঞতার অন্ধকার এক মাত্র মহামায়া দূর্গা দেবীই দুর করতে পারেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানে বলা হয়েছে কৃষ্ণ বহির্মুখ হলেই জীব ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে। দুর্গাদেবী হরিভক্তি পরায়ণ জীবদের প্রতি তিনি দূর্গতি নাশিনী। দুর্গা পূজার প্রকৃত সময় বসন্তকাল। বসন্তকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ দুর্গা পূজা করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানে মেধা মুনির কৃপায় সমাধি বৈশ্যকে দেবী কৃষ্ণ মন্ত্র দান করেন। এতে তারা তাদের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মহা মুক্তি লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের মন্দিরে গিয়ে বিষয় আসয় চাইতে পারেন নি। তিনি ভক্তি জ্ঞান বৈরাজ্ঞ চেয়ে ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০.২২.০৪) বলা হয়েছে, হে মহা দেবী কাত্যায়ণী (দুর্গা) হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিনী, শক্তি মালিনী, সর্ব নিয়ন্তা, কৃপা করে নন্দ মহা রাজের পুত্র শ্রী কৃষ্ণকে আমার পতি করে দাও। সাধারণ মানুষ দুর্গা পূজা করে কোন জাগতিক লাভের আশায় কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণকে লাভ করার আশায় দুর্গা পূজা করে ছিলেন। দুর্গা দেবী হলেন কৃষ্ণের বহিরাঙ্গ শক্তি। শক্তি, শক্তি মানের ভেদ নেই।

স্কন্দ পুরানের মাহেশ্বর খন্ডে বলা হয়েছে, এক সময় দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে স্বর্গ চ্যুত হন। তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে শিব ও বিষ্ণুর সমপবর্তী হলেন। দেবতাদের মুখে মহিষাশুরের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করেন। বিষ্ণুর নিদের্শে দেবতাগন তাদের সবার শক্তি একত্রীভূত করলেন। বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার মুখ মন্ডল' থেকে তেজ নির্গত হলো। সৃষ্টি হলো একনারী মুর্তি। বিষ্ণুর তেজে তাঁর বাহু সমূহ, ব্রহ্মার তেজে তাঁর পদযুগল, শিবের তেজে দেবীর মুখ মন্ডল সৃষ্টি হলো। ইন্দ্রের তেজে তাঁর শরীর, বরুনের তেজে তাঁর বক্ষ্য ও উরুদ্বয় এভাবেই মহাশক্তি দূর্গা রূপে প্রকাশিত হলেন। দেবতারা তাদের দেয়া নিজ নিজ অস্ত্র থেকে এক একটি অস্ত্র নির্মান করে দেবীকে প্রদান করলেন। দেবতা বিজয়ী মহিমাসুর মহাশক্তিময়ী দুর্গা দেবীর হাতে বধ হন।" আঘাত কর মা দশভুজা, যতই আঘাত করবে ততই পাবে রক্ত পূজা"। মহিমাসুরের অন্তিম প্রার্থনায় দেবীর পদ তলে মহিষাসুর পূজা পেয়ে আসছে। শ্রীশ্রীচন্ডী পূরাণে দেবীর বিস্তারিত ঘটনাবলি বর্ণনা রয়েছে। চন্ডীদাস বাসুলী দেবীর পূজা করে গোবিন্দের কৃপা লাভ করে ছিলেন। শক্তিমানের ইচ্ছায় শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। শক্তির কখনো স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকতে পারে না। তেমনই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রী কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দুর্গাদেবী। শ্রী কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া স্বতন্ত্র ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে ভগবান কে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বা তার প্রতি ভক্তি লাভের জন্য কেউ যদি শক্তি পুজা করেন তাই যথার্ত শক্তি পূজা। শ্রীরাম প্রসাদ, শ্রীরাম কৃষ্ণদেব, শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারি ভক্তির মাধ্যমে শক্তিময়ীর কৃপায় পরম পুরুষকে লাভ করে ছিলেন। মহা মায়ার মহা তত্ত্ব জানা সহজ কথা নয়। মহালায়ার মহাতত্ত্ব যদি জানতে বাসনা থাকে, তবে মেধামুনির স্মরণ নিতে হবে। মহালায়ায় মহাদেবীর সর্বত্র কৃপা বর্ষিত হোক। বিশ্ব হোক শান্তিময়। হরে কৃষ্ণ।

লেখক : শিক্ষক, কবি ও সাংবাদিক

প্রসঙ্গঃ দুর্গাপূজা

শৈলী কর্মকার

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবাঙালিরাও ভিন্ন ভিন্ন নামে এ উৎসব পালন করে। যেমন কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যে অম্বা ও অম্বিকা, গুজরাটে হিঙ্গুলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় উমা এবং কুমারিকা প্রদেশে কন্যাকুমারী নামে দেবীর পূজা ও উৎসব পালিত হয়।

দুর্গা পৌরাণিক দেবতা। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর নামে এক দানব স্বর্গরাজ্য দখল করলে রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর এক নাম হয় মহিষমর্দিনী। কালীবিলাসতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভাগবত, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দুর্গোৎসববিবেক, দুর্গোৎসবতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে দেবী দুর্গা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর এক নাম 'বাসন্তী' পূজা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বাসন্তী পূজা হয় চৈত্রের শুক্লপক্ষে, আর শারদীয়া পূজা হয় সাধারণত আশ্বিনের কখনও বা কার্তিকের শুক্লপক্ষে। বর্তমানে শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত। এসময় শুক্লা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নমবী (মহানবমী)-তে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এদিন দশোহরার মেলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নতুন পোশাক পরে দশোহরার মেলায় যায়। মেলার দিন নৌকা বাইচ বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। সকলে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

দুর্গাপূজা তিন প্রকার: সাত্ত্বিক (জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ ভোগ দ্বারা পূজা), তামসিক (কিরাতদের জন্য বিহিত; এতে জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্র নেই; মদ্য, মাংস প্রভৃতি দ্বারা পূজা করা হয়) ও রাজসিক (পশুবলি ও আমিষ ভোগ দ্বারা পূজা করা হয়)। অতীতে দুর্গাপূজার সময় ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ, শূকর, গন্ডার, ব্যাঘ্র, গোসাপ, কচ্ছপ বা পাখি বলি দেওয়া হতো; কোনো কোনো গ্রন্থে নরবলির বিধানও আছে। বর্তমানে অবশ্য বলির প্রচলন নেই বললেই চলে।

দেবী সাধারণত দশভুজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁর বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি।

প্রতিমার রং হতে পারে অতসীপুষ্পবর্ণ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ। প্রতিমা ছাড়াও পূজা হতে পারে দর্পণে, অনাবৃত ভূমিতে, পুস্তকে, চিত্রে, ত্রিশূলে, শরে, খড়গে বা জলে। দুর্গাপূজায় হিন্দুদের সকল বর্ণের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

বলা হয়ে থাকে যে, বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, মতান্তরে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কিন্তু জীমূতবাহনের দুর্গোৎসবনির্ণয়, বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, শূলপাণির দুর্গোৎসববিবেক, কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, বাচস্পতি মিশ্রের ক্রিয়াচিন্তামণি, রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় অনুমান করা হয় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়তো কংসনারায়ণ কিংবা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে তা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকে কলকাতায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয়ানরাও দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করত। ধনীদের গৃহে বাইজি, নর্তকী এবং গায়িকারা অংশগ্রহণ করত। কোথাও কোথাও যাত্রাগান, পাঁচালি ও কবিগানের আসর বসত।

পূজার আগে খড়-মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে তাতে কাঞ্চনবর্ণের রং লাগানো হয়। অতীতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িসহ আরও কয়েকটি সম্পন্ন পরিবার প্রতিমায় দামি শাড়ি, এমনকি সোনার গহনা পর্যন্ত পরাত এবং তৎসহ প্রতিমা বিসর্জন দিত। বাংলাদেশের সর্বত্রই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে করে, কেউবা সমষ্টিগতভাবে। সমষ্টিগত পূজাকে বলা হয় বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র মিলিত হয়। ঢাকার সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এছাড়া শতাধিক মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন-মন্দিরে অষ্টমীর দিন আট/নয়া বছরের একটি বালিকাকে দুর্গা সাজিয়ে কুমারী পূজা করা হয়। দশমীর দিন সরকারি ছুটি থাকে। এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে এবং বেতার-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। দশমীর দিন সকাল থেকে চলে বিসর্জনের আয়োজন। মিছিল সহকারে প্রতিমা নিয়ে বিকেল থেকে শুরু হয়া নিকটস্থ নদী-খাল-বিল কিংবা পুকুরে বিসর্জনের পালা। ঢাকার অধিকাংশ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়া বুড়িগঙ্গার জলে। এভাবে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়া পাঁচদিনব্যাপী দুর্গোৎসব।

তথ্যসূত্র : বাংলা পিডিয়া

পঞ্চতত্ত্ব

সঞ্জীব কুমার সাহা

সংস্কৃতে পঞ্চ মানে পাঁচ এবং তত্ত্ব মানে সত্যতা বা বাস্তবতা। পঞ্চতত্ত্ব বলতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যে ঈশ্বর বা পরম সত্যের পাঁচটি দিককে ইঙ্গিত করে বা বোঝায়। হিন্দুধর্মের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অনুসারে, পঞ্চতত্ত্ব হলো পাঁচটি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব–শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, গদাধর পণ্ডিত, এবং শ্রীবাস ঠাকুর–যাঁরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণ) পাঁচটি ভিন্ন রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরাই পৃথিবীতে 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ছড়িয়ে দেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস প্রণীত (বৃহৎ সচিত্র) গরুড় পুরাণ দ্বাদশ অধ্যায় পঞ্চতত্ত্বার্চন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরূদ্ধ আর প্রদুম্ন ও নারায়ণ রূপ যে তাঁহার। এই পাঁচজন দেবতা হলেন পঞ্চতত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-এর কলিযুগাবতার। -(ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে গোবিন্দ) চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ভারতবর্ষে আবির্ভূত এক বহু লোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু মহাপুরুষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। তিনি গৌড়বঙ্গের নদিয়া অন্তর্গত নবদ্বীপে (অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা) হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীমতী শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমাবতার বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভাগবত দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক। তিনি বিশেষত পরম সত্ত্বা রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পর্যন্ত শ্রীহরি নাম, ভক্তি ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করেন যা শ্রীকলিসন্তরণ উপনিষদে ও শ্রীপদ্মপুরাণের হরপার্বতী সংবাদে উল্লেখিত রয়েছে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে এই কলিযুগে জড়জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে পারমার্থিক ধামে যাবার একমাত্র পন্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌঃ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।।

মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু

স্বয়ং ভগবান অনন্ত-শেষ শ্রী সঙ্কর্ষণ এর কলিযুগাবতার। -(ত্রেতায় লক্ষণ, দ্বাপরে বলরাম)

নিত্যানন্দ প্রভু (নিতাই নামেও পরিচিত) হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাষ্য অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের অবতার। তিনি ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রধান ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ বা সঙ্গী। তাদের দুজনকে একত্রে গৌর-নিতাই বা নিমাই-নিতাই নামে অভিহিত করা হয়। নিত্যানন্দ বৈষ্ণবীয় পঞ্চতত্ত্বের একজন।

তিনি ১৪৭৪ সালের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বনাম ছিল কুবের। তাঁর কয়েকজন ভাই ছিল। বৈষ্ণব ভজন গাওয়ার জন্য তাঁর নিষ্ঠা এবং দুর্দান্ত প্রতিভা খুব ছোটবেলা থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি ছেলেবেলায় অন্যান্য ছেলেদের সাথে ভগবান রামের লীলার পুনর্নিমাণে রামের ছোট ভাই লক্ষণের ভূমিকা পালন করতেন।

খুব অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী লক্ষ্মীপতি তীর্থের সঙ্গে বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণে বের হন। নিতাইয়ের বাবা সন্ন্যাসীকে উপহার হিসেবে কিছু দিতে চাইলে লক্ষ্মীপতি তীর্থ জবাব দিয়েছিলেন যে তীর্থস্থানে যাতায়াত করতে তাঁকে সহায়তা করার জন্য কারও প্রয়োজন এবং নিতাই এই কাজের জন্য নিখুঁত হবেন। যখন তিনি এ কথা বলেছিলেন হাড়াই পণ্ডিত নিতাই থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চিন্তায় দুঃখ বোধ করছিলেন। তবে তিনি রাজি হয়েছিলেন। কারণ একজন সাধু ব্যক্তির অনুরোধ সর্বদা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। নিতাই তাঁর ভ্রমণে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। এভাবে নিতাইয়ের দীর্ঘ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। যা তাকে বৈষ্ণব মতের গুরুদের সাথে পরিচিত করায়। তিনি অবধুত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হন। এছাড়া লক্ষ্মীপতি তীর্থের বিখ্যাত শিষ্য মাধবেন্দ্র পুরী, অদ্বৈত আচার্য এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক গুরু ঈশ্বর পুরীর সাথে তার পরিচয় হয়।

অদ্বৈত আচার্য

ভগবান বিষ্ণু এবং মহাদেব শিবের মিলিত কলিযুগাবতার।

অদ্বৈত আচার্য বা অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বৈষ্ণব দার্শনিক এবং ধর্মবেত্তা। তার পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিলো কমলাক্ষ মিশ্র। পুরীর রথযাত্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশে তিনি শ্রীচৈতন্যকে অবতার ঘোষণা করেন।

অদ্বৈতাচার্য বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান সিলেট জেলা) নবগ্রাম-লাউড় গ্রামের এক বারেন্দ্র বাক্ষণ পরিবারে জন্ম নেন। জন্মের সময় তার পারিবারিক নাম ছিলো কমলাক্ষ। জন্মের পর তার অনেকটা সময় সিলেটেই কাটে। এরপর তিনি নদিয়া জেলার শান্তিপুরের গঙ্গতটে (বর্তমানে মতীগঞ্জ) স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বৈষ্ণব দীক্ষার জগতে তার গুরু ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। দীক্ষা লাভের পর তিনি অদ্বৈতাচার্য উপাধি লাভ করেন। তার গুরু মাধবেন্দ্রপুরী চৈতন্যদেবেরও পরম গুরু ছিলেন। শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই অদ্বৈতাচার্য প্রসিদ্ধি

লাভ করেছিলেন। নবদ্বীপের ভক্তদের জন্য তিনি একজন পথ প্রদর্শনকারী ছিলেন।

বৈষ্ণব মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন চৈতন্যদেব। অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দের সঙ্গী হিসেবে এই মতবাদ প্রচারে আত্মমগ্ন হন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনিই প্রথমবারের মত নিমাইকে (শ্রীগৌরাঙ্গ) স্বয়ং ভগবান মানেন। পুরীতে এক রথযাত্রার অনুষ্ঠানে তিনি চৈতন্যদেব যে একজন অবতার তা ঘোষণা করেন। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রী চৈতন্য শান্তিপুরে আসলে তিনি বিদ্যাপতির পদ গেয়ে তাকে স্বাগত জানান। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য নেপাল থেকে গণ্ডকী নদীর থেকে নারায়ণ শিলা প্রাপ্ত হন যা আজও বড়ো গোস্বামী বাড়িতে নিত্য পূজিত হয়ে আসছেন। মদনগোপাল নামক চিত্রপট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার দুই সহধর্মিনীর নাম হল শ্রীদেবী ও সীতাদেবী। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তার দশমতম বংশধর।

গদাধর পণ্ডিত

শ্রীরাধা এবং ভগবান কৃষ্ণের অভ্যন্তরীণ শক্তির যৌথ কলিযুগাবতার। -(ত্রেতায় সীতা, দ্বাপরে রাধা)

গদাধর পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। তারা শৈশবকাল তথা সন্ন্যাসী জীবনের এক দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মতে তিনি পঞ্চতত্ত্বের একজন অন্যতম সদস্য। তাকে রাধারানী, ললিতা (গোপী) বা এদের মিলিত অবতার হিসাবে মনে করা হয়।

শ্রীনিবাস ঠাকুর

শ্রীবাস ঠাকুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অকৃত্রিম উপাসক দেবর্ষি নারদ এর কলিযুগাবতার।

শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর ছিলেন একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব গুরু, জীব গোস্বামীর শিষ্য এবং যদুনন্দন দাস ও রাধাবল্লভ দাসের শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজা বীর হাম্বীরকে বৈষ্ণবে রূপান্তরিত করেন। তার মেয়ে হেমলতা ঠাকুরানিও একজন গুরু ছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য একজন পর্ষদ। তিনি হলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর অবিনা কালেভর বা অভিন্ন দেহ। এটা বিশ্বাস করা হয় যে শ্রীচৈতন্য শ্রী শ্রীনিবাস আচার্যের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের বাণী প্রচারের কাজ করেছিলেন। এই পৃথিবীতে আসার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ভগবান চৈতন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর দুটি সম্প্রসারণ ছিল: প্রথম সম্প্রসারণ হল ছয় গোস্বামী, যাদেরকে তিনি বৃন্দাবন আবিষ্কার করার, ভগবানের দেবতার পবিত্র উপাসনা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ভক্তি-গ্রন্থ, ভক্তি পথ রক্ষা করার জন্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ প্রভুর মাধ্যমে তাঁর মিশনের গৌণ সম্প্রসারণ ঘটেছিল, যারা সারা ভারতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিলেন। তারা গড়ে তোলেন মহান আধ্যাত্মিক সংকীর্তন দল। শ্রীনিবাস আচার্য বৈষ্ণব আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন এবং ভারতের সমভূমি জুড়ে কৃষ্ণ ভক্তি মার্গের প্রচারের জন্য দায়ী ছিলেন।

পঞ্চতত্ত্বের মন্ত্র

গৌড়ীয় ঐতিহ্যে পঞ্চতত্ত্বেরর মন্ত্রে পাঁচজন সদস্যের নাম উল্লেখ আছে। এটি ভক্তিমূলক মন্ত্র যাকে ধ্যানের (জপ) উপায় হিসেবে গাওয়া হয়। প্রায়শই হরে কৃষ্ণ মন্ত্র গাওয়ার সময় এই মন্ত্র গাওয়া হয়ে থাকে। অনুগামীরা বিশ্বাস করে, এটি কলি যুগের করুণাময় মন্ত্র।

"জয় শ্রী-কৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রী-অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাধি-গৌর-ভক্তবৃন্দ।"

লেখক: সহ-সভাপতি, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে 'ধর্ম'

বিমল কুমার সাহা

'ধর্ম' শব্দটি দুই অক্ষরের হলেও, এর প্রভাব ও ব্যাপ্তী ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাপী। সমগ্র পৃথিবীতে, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং চর্চিত বিষয়ও 'ধর্ম'। স্রষ্টার সৃষ্টি এক হলেও, সেই একই সৃষ্টিতে বসবাসকারী মানুষের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম রয়েছে। আবার, একই ধর্মের মধ্যে আলাদা আলাদা সম্প্রদায় রয়েছে। আবার, একই সম্প্রদায়ের ব্যক্তি পর্যায়ে ধর্ম পালনেও আলাদা আলাদা নিয়মকানুন এবং আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। 'ধর্ম' এর ব্যাখ্যা নিয়েও দ্বন্দ সংঘাতের এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহেরও যেন শেষে নেই। সনাতন ধর্মে, একটা যুগের (দ্বাপরযুগ) পরিসমাপ্তি ঘটেছিল 'ধর্মযুদ্ধ' নামে খ্যাত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মাধ্যমে।

শ্রীকৃষ্ণ

সনাতন ধর্মমতে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, দ্বাপর যুগে মানুষরূপী ঈশ্বরের অবতার। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি অর্জুনের রথের সারথী। যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না এবং যুদ্ধও করবেন না। এই যুদ্ধের ঘটনাক্রমে বিপক্ষ কৌরবদের সেনাপতি 'ভীষ্ম'-এর সাথে বাকযুদ্ধে 'ধর্ম' শব্দটির যে ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন, আমার মতে, উক্ত ব্যাখ্যাই ধর্মের সার্বজনিন উত্তম ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য। আসুন, শ্রীকৃষ্ণের সেই 'ধর্ম'-এর ব্যাখ্যা সর্ম্পকেই আলোকপাত করা যাক।

ভীষ্ম

মাতা গঙ্গার পুত্র। পিতাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে সর্বাপেক্ষ যোগ্য উত্তরাধিকার হয়েও রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হননি। সারাজীবন ব্রহ্মচার্য্য পালন করেছেন, কঠিন তপস্যা দ্বারা 'ইচ্ছামৃত্যুর' বরদানপ্রাপ্ত কৌরবদের সেনাপতি।

প্রেক্ষাপট ও কাহিনি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নবম দিন। শুরু থেকে ভীষ্ম অপ্রতিরোদ্ধভাবে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে এই পাণ্ডবপক্ষের অনেক মহারথিকে বধ করে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, ভীষ্মকে এইমুর্হূতে থামানো না গেলে, আজই কৌরবদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে। ধর্ম স্থাপনের মাধ্যমে নূতন যুগের সূচনা করা তাঁর মহা পরিকল্পনা সুদূর পরাহত রয়ে যাবে। তিনি রথ ঘুরিয়ে ভীষ্মের মুখোমুখি হলেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই গর্জে উঠলেন। বললেন, আমার সামনে যে আসবে, আমি তাঁকেই বধ করবো। আমি ধর্মে আছি। তাই আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিত্তোরে বললেন, 'আপনার ধর্ম সর্বৈব মিথ্যা। তাই, এই মুহূর্তে আপনাকে আমি বধ করতে পারি। আপনাকে বধ করার জন্য আমার কোন অস্ত্রেরও প্রয়োজন হবেনা। আমি এই পরিত্যাক্ত রথের চাকা দিয়েই আপনাকে বধ করবো।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ নিজের রথ ছেড়ে ভূমিতে নামলেন এবং সামনে পড়ে থাকা এক পরিত্যাক্ত রথের চাকা খুলে ভীষ্মের দিকে ছুড়ে মারতে উদ্যোত হলেন। নিজের ধর্মকে মিথ্যা বলায়, ভীষ্মের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ক্ষিপ্ত ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, আমার ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করার আপনার কোন অধিকার নেই। এই বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিকে অব্যর্থ গুচ্ছবান ছুঁড়ে দেন।

এবার ভীষ্ম অবাক বিষ্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর ছোঁড়া তীরসহ সমগ্র কুরুক্ষেত্র স্থিরচিত্র হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে বললেন, 'আমি শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, না-আমি মানুষ, আমিই পরমব্রহ্ম গুরু শ্রেষ্ঠ। আমি সত্য, জ্ঞান ও ধর্ম। আমার অনুমতিতেই আপনি যুদ্ধ করছেন, আমার অনুমতিতেই আপনি জীবিত আছেন, আমার অনুমতিতেই আপনার মৃত্যু হবে।' ভীষ্মের সংবিত ফিরে এলো, তিনি প্রকৃত সত্য উপলদ্ধি করলেন এবং রথ ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত বলে জানালেন। তবে, তিনি বিনয়ের সাথে তার যাপিত জীবনাচার তুলে ধরে বলেন, জীবনে কখনো তিনি অধর্মের কোন কাজ করেন নি। কখনো মিথ্যা বলেন নি। সারাজীবন ব্রহ্মচার্য্য পালন করছেন। পিতাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে যেয়ে তিনি শুধু ত্যাগই করেছেন। তাহলে, তার 'ধর্ম' কীভাবে মিথ্যা হতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনিতো পিতাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করাকেই 'ধর্ম' বানিয়ে নিলেন। প্রকৃত ধর্ম জ্ঞানের অন্বেষণই করেন নি। ধর্মতো মুক্তি প্রদান করে। অথচ আপনি ধর্মকে রাজসিংহাসনের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করলেন। সমাজের কল্যাণে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব ভুলে গেলেন। আপনি কর্ম করাই ছেড়ে দিলেন। আপনার এহেন ধর্ম পালনের কারণে একজন অযোগ্য নেত্রহীন ব্যক্তি রাজসিংহাসনে রাজারূপে অধিষ্ঠিত হন। তারই সহযোগিতায় তার শতপুত্র ধর্মের পথ ছেড়ে রাজ্যাব্যপী প্রজাদের উপর নির্যাতন করতে থাকে। আপনার উপস্থিতিতে রাজসভায় কুলবধূর বস্ত্রহরণের মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতারণার দূতক্রিয়ার মাধ্যমে পাণ্ডবদের রাজ্য ছাড়া করা হয়। অথচ, এসব জঘন্য অধর্মের কাজ রোধ করার পর্যাপ্ত সামর্থ্য এবং আপনার দায়িত্ব থাকার পরও আপনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার নামে তা পালন করেননি। এরই ফলশ্রুতিতে আজকের এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। একটা যুগের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি ভীষ্মকে প্রশ্ন রেখে বলেন, এরপরও আপনি বলবেন-আপনি ধর্মের পথে আছেন? আপনার ধর্ম সত্য? শ্রীকৃষ্ণ 'ধর্ম' এর ব্যাখ্যায় বলেন, ধর্মতো সর্বদা অপরের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য নিবেদিত। অপরের তথা সমাজের মঙ্গলার্থে ব্যক্তি পর্যায়ে সৎকর্ম (নিষ্কাম কর্ম) করে যাওয়ার নামই ধর্ম। ধর্মে হিংসা, বিদ্ধেষ, হানাহানির কোন স্থান নেই-শুধুই সকলের মঙ্গল কামনায় সৎকর্ম করে যাওয়ার নামই 'ধর্ম'।

এজন্য সনাতন ধর্মে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে সকলের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করতে হয়। সকলের মঙ্গল কামনার সাথে নিজের মঙ্গলও নিহীত থাকে। সনাতন ধর্মে বহুল প্রচলিত প্রার্থনা মন্ত্র হলো, ওঁ সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ দুঃখভাগ ভবেৎ। বঙ্গানুবাদ: বিশ্বের সকলেই সুখী হোক, সকলেই আরোগ্যভোগ করুক, কেউ যেন দুঃখভোগ না করে।

লেখক : উপদেষ্টা, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

দেবল কুমার দাশ এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

আমাদের প্রাণপ্রিয় উপদেষ্টা দেবল কুমার দাস অতি সম্প্রতি ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে যাত্রা করেছেন। বিগত সময়ে উনার সহযোগিতা, উপদেশ, পৃষ্টপোষকতা তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দীর্ঘদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। শারদীয় দুর্গোৎসবের এ বছরের সকল আয়োজনে প্রিয়জন হারানোর বেদনা আমাদের সকলকে শোকাচ্ছন্ন করে থাকবে। অনন্তলোকে অনন্তধামে পরম শান্তিতে থাকুন।

জগতে যেসব বস্তু বাস্তবিকভাবে দেখা যায় বা কেউ না কেউ নির্মাণ কর্তা আছেন। কেন না সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকে কোন বায়ু তৈরি হয় না। তেমনি সমুদ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, নক্ষত্রদি যা সব সময় দেখতে পাই তারও কোন নির্মাণ কারী নিশ্চয়ই আছেন। এই সমস্ত আবিষ্কারক আমাদের মত সামান্য মানুষ নিশ্চয়ই নন। এর নির্মাতা বা আবিষ্কারক এক সর্বময় ঈশ্বরই হতে পারেন। সমুদ্র যে নিমর্যদায় অধিষ্ঠিত চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিত সময়ে উদয় ওঅস্ত হয়, এসবের নিয়ামক বা সঞ্চালক নিশ্চয় কেউ আছেন। এদের সব কিছুর মূলে সর্ব নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বর আমরা সর্ব নিয়স্তা ঈশ্বরকে ভুলে যাই, তাই আমাদের দূর্যোগ নেমে আসে।

কালের ভীষণ দূর্যোগ দেখে নানা রকমের অত্যাচার দেখে ধার্মিকগণের মনে চাঞ্চল্য সততায় দৃশ্যমান হচ্ছে। প্রশ্ন আসছে এত অত্যাচার দেখেও ভগবান কেন প্রকট হচ্ছেন না? তাহলে গীতায় যা বলা হয়েছে তা কী ঠিক নয়? শ্রীমদ্ভবদগীতায় (৪/৭-৮) ভগবান নিজেই বলেছেন, হে ভারত (অর্জুন) যখনই ধর্মের গ্লানি অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখনই আমি রূপ পরিগ্রহণ করি অর্থাৎ সাকার রূপে জন সমাজের সামনে প্রকট হই। সাধু পুরুষদের উদ্ধার করার জন্য পাপাচারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে থাকি।

ভগবান যখনই অবতার হয়েছেন সে সময়কার অবস্থা যদি একটু চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সেই কত পাপপূন্য ছিল। সত্যযুগে হিরণ্য কশিপুর রাজ্যে এমন রাজ আজ্ঞা ছিল যে, কেউ ধর্মাচারণ করবেন এবং হরিকে যে ভক্তি করলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। হরি নামও কেউ করতে পারবে না। এই রকম রাজ আজ্ঞা রাজার ছেলে প্রহ্লাদ না মানায় তাকে ঘোরতর দলীলাও স্বরূপকে স্বরণ করা ভগবানের চরণ সেবা করা, ভগবানের বিগ্রহকে পূজা করা, এবং তাকে প্রনাম করা, দাস্যভাবে আদেশ পালন করা, সখ্যভাবে প্রেম করা, নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করা (শ্রীম ভ্ভগত-৭/৫/২৩)। এই কথা শুনে হিরণ্য কশিপু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন রেখেছিল- এ কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে? আমার রাজ্যে আমার পরমশত্রু বিষ্ণুকে ভক্তি করার উপদেশ দিয়ে আমার হাতকে মৃত্যু মুখে পতিত হতে চায়? প্রহ্লাদ তার উত্তরে জানিয়েছেন- হে পিতা: হৃদয়স্থিত ভগবান বিষ্ণুই তো সমগ্র জগতের উপদেশক, সেই পরমাত্মা ছাড়া- কে কাকে কি শিখাতে পারে (বিষ্ণুপুরান ১/৭/২৬)। বিষ্ণু ভগবান কেবল আমার হৃদয়েই নেই। তিনি আছেন সর্বলোকে। তিনি সর্বত্রগামী, তাই তিনি আমাকে, আপনাকে এবং সকল প্রাণিকে তাদের আপন আপন চেষ্ঠায় প্রবৃত্ত করেন। এই কথা শুনেই রাক্ষসরাজ হিরণ্য কশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং ভক্ত প্রহ্লাদকে নানাভাবে তীব্র কষ্ঠ দেওয়া হলো। হরিনাম করায় প্রহ্লাদকে বিষ খাওয়ানো হলো পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হলো সাপ দিয়ে কামড়ানো হলো, আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, ইত্যাদি নানা রকম রাক্ষসেরা জোর জবরদস্তি করে ও তার কিছুই ক্ষতি করতে পারে নি। প্রবল শত্রু সামনে এসে গেলে ও সংসার নিজ গতিতে চলে যায়, তার একটা চুল ও কেউ ছিড়তে পারে না। ভক্ত প্রহ্লাদের উপর খুব অত্যাচার হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত থামের ভিতর থেকে প্রহ্লাদের প্রিয় প্রভু নৃসিংহদের কে প্রকট হতে হয়েছিল। ত্রেতা যুগে জানা যায় মুবাহু মারীচি রাক্ষস যজ্ঞ ধ্বংস করে দিত। মুনিদের ধ্বংস করত। শুধু তাই নয়, অনেক রাক্ষস ঘোরতর অত্যাচার ও করত। রামায়ন পাঠে (অরণ্যকে) জানা যায় সেই সময় রাক্ষসেরা ফলমূল ভক্ষণকারী তপস্বী মুনি ঋষিদের ভক্ষণ করে তাঁদের হাড়ের রূপ দিয়েছিল। তখন সেই অবস্থায় রামচন্দ্র মানুষের রূপ নিয়ে অবর্তীণ হয়েছিলেন।

সত্য ন্যায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাই ধর্ম। ভগবান তাই ধর্মের গ্লানি ও পাপের বৃদ্ধিক্ষণে প্রকট হয়ে ধর্মকে রক্ষা ও সাধুদের পরিত্রান করেন। ধর্মের ভিত্তিতেই পৃথিবী টিকে আছে। ধর্মের দ্বারাই সূর্য তাপ বিকিরণ করছে, ধর্মের দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত। সমগ্র বিশ্ব সংসার ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভবদগীতার (১৫/১২-১৩) শ্লোকে বলা হয়েছে যে তেজ সূর্য্য থেকে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং তেজ চন্দ্রমা ও অগ্নিতে আছে। তা আমরাই তেজ জানবে। আমি রসময় চন্দ্র ওষধি সকল পরিপুষ্ঠ করে অবস্থিত আছি।

অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রতি পদিত বিধি বাক্য গুলোই হলো ধর্ম। ধর্ম ত্যাগ করে যারা অনীত করে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসই হয়ে যায়। কংস, রাবনেরা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসই হয়েছিল। শ্রীমদ্ভবগীতা (১২/৪) অনুসারে স্পষ্টতর এই বলা হয়েছে যিনি ধর্মকে জানেন, তিনি দুর্বল দারিদ্রের উপর অত্যাচার করবেন এবং কারও ধন আহরণ করবেন, কাউকে বিরক্ত করবেন তা হতেই পারেন। বরং তিনি জেনে শুনে একটি পিপড়া কেউ কষ্ট দেবেন না, যে মানুষ জেনে শুনে কোন জীবকে সামান্য তম কষ্টও দেয় তার কাছে ধর্মের তত্ত্বের তো কেবল প্রশ্নই ওঠে না যে ধর্মতত্ত্বজ্ঞানী মানুষের কাছ থেকে শিক্ষাও পায়নি কেন না শাস্ত্রে অহিংসাকে কেউ পরম ধর্ম বলা হয়েছে। ধর্মপথে শাস্ত্রানুরূপ কর্ম করার জন্য শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলে মানব জীবন সুখ ও সুন্দর করার জন্য শাস্ত্র বিধিকে মেনে চলার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শ্রী শ্রী গীতার (১৬/২৩-২৪) শ্লোকে মানব জাতিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, "যে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত, যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, তাহার শান্তি সুখ ও হয় না, মোক্ষ লাভও হয় না। অতএব কর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমান, সুতরাং শাস্ত্রস্ত ব্যবস্থা জেনে যথাধিকার কর্মে প্রবৃত্ত হও।" সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিধান মেনে জীবনকে পরিচালিত করলে সকল অধর্ম অনীতকামী বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কখনো টিকে থাকতে পারে না। শাস্ত্র লংঘনকারী, মনগড়া যুক্তি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তে ফেলে শাস্ত্র বিষয়ে মূঢ় ব্যক্তি অনীতির দ্বারা নিজের কল্যাণ করতে পারে না। অপরের কল্যান করতে পারে না। তাই বিভ্রান্তকারী সর্বত্র পরিহার যারা উচিত। স্পষ্ঠতই প্রমান করে ধর্মও শাস্ত্র নীতি মেনে চলেই সকলেই জয় লাভ করেছেন।

জাতির এই মহা দূর্যোগে আমাদের করনীয় প্রসঙ্গে আজ থেকে প্রায় ১৭২ বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র যা নিয়ে চিন্তা করতেন আজ আবার আমাদের সে বিষয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন- দেখ ভাই কেহ একা নামিও না, ঐক্যই বল নহিলে আমরা কেহ নই। চল আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু কিন্তু পৃথিবী রাখিব। আমরা কেহ একা নামিতে চাহি না। আসুন নবচেতনায় স্নাত হয়ে সমবেতভাবে সুন্দর পৃথিবী রক্ষা করতে সচেষ্ঠ হই সকল শুভ শক্তি এক হলে কোন অশুভ শক্তি টিকে থাকতে পারে না। তুলসী দাস বিরচিত রামচরিত মানস (১/২৮/১) এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ভগবানের নাম যদি কোন প্রকার অবহেলা, সংক্ষেপ বা পরিহাস ইত্যাদির সঙ্গেও করা হয়, তাহলেও তিনি পাপের নাশ করবেনই।" সমবেত শুভ শক্তির পরাজয় নেই। ধর্মীয় এ শিক্ষাই আমাদের চেতনায় সুদৃঢ় হোক।

শ্রীকৃষ্ণ সকল নিয়মনীতি মেনেই জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য তিনি সর্বোতোভাবে প্রচেষ্টা নিয়েছেন কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি"। একান্ত অন্যন্যোপায় হয়ে যুদ্ধ করতে হলো। শর্ত ছিল যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না। কিন্তু এক পর্যায়ে তাকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তের কল্যাণ নিজেই প্রকটিত হয়।

জয় শ্রীকৃষ্ণ।

লেখক : দেবল কুমার দাশ, প্রয়াত উপদেষ্টা, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

ন্যাশনাল লাইফের আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স সুশাসন, স্বচ্ছতা ও আইন-কানুন যথাযথ পরিপালনের জন্য প্রথম স্থান অর্জন করে ১৪তম আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

১৪ নভেম্বর ২০২৪ সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা জনাব **ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ** ও বাণিজ্য উপদেষ্টা জনাব **শেখ বশিরউদ্দিন** থেকে ন্যাশনাল লাইফের সিইও **মোঃ কাজিম উদ্দিন** ও সিএফও **প্রবীর চন্দ্র দাস এফসিএ** উক্ত অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসি
নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী

শারদীয়ার মাহাত্ম্য ও কুমারী পূজা

সোমা ঘোষ মণিকা

"বনে বনে আজ লেগেছে দোল,
শারদ-প্রভাতে শিশিরের হিল্লোল।

সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে আকাশে পেজা তুলো ছড়াতে ছড়াতে ডাক, ঢোল বাজিয়ে হাজির হয় শারদীয়া উমা।"

শরৎকালে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি হিন্দুদের অন্যতম আরাধ্যা দেবী দুর্গা। কথিত আছে যে, দেবী দুর্গা দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছিলেন। আবার তিনি ভক্তদের দুর্গম বা দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন, তাই তাঁর নাম দুর্গা। দেবী দুর্গা মাতৃরূপে পূজিত হয়ে থাকেন।

সাধারণত শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দেবী দুর্গার অকালবোধন করেন। সেই থেকে শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজাকে শারদীয়া দুর্গাপূজা বা অকালবোধন বলা হয়ে থাকে। মহালয়া ও শ্রীপঞ্চমী থেকে মহাবিজয়া দশমী পর্যন্ত দেবীর আরাধনা চলে।

শ্রীপঞ্চমী থেকে বিজয়া দশমী

শ্রীপঞ্চমী: দেবীর আঁচল ধীরে ধীরে মর্ত্যে স্পর্শ করে। এটি পূজার সূচনা ধাপ।

ষষ্ঠী: দেবীর বোধন, অধিবাস ও আমন্ত্রণ সম্পন্ন হয়। মা দুর্গার আবির্ভাব ঘটে।

সপ্তমী: কল্পারম্ভ ও নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে পূজার মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অষ্টমী: মহাপূজার শ্রেষ্ঠ দিন। অঞ্জলি, আরতি ও স্যান্ডি পূজা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কুমারী পূজার আয়োজনও থাকে।

নবমী: চণ্ডীপাঠ, হোম ও দেবীর পূর্ণ আরাধনা করা হয়। দেবীকে তুষ্ট করার দিন।

বিজয়া দশমী: দেবী দুর্গাকে বিদায় জানিয়ে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মর্ত্যলোক থেকে দেবীর স্বর্গারোহণ হয়।

কুমারী পূজা:
সংক্ষিপ্ত পরিচয়:
কুমারী পূজা হলো হিন্দুধর্মের এক পবিত্র আচার, যেখানে এক বা একাধিক কুমারী (অজাতপুষ্পা) বালিকার মধ্যে দেবী দুর্গার রূপ দেখে তাকে মাতৃরূপে পূজা করা হয়। দুর্গাপূজার অঙ্গ হিসেবে এই পূজা বিশেষত নবরাত্রির অষ্টমী ও নবমীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। এটি নারীশক্তিকে সম্মান জানানোর এক প্রতীকী প্রথা।

মূল ধারণা:
দেবী রূপ: কুমারী বালিকাদের মধ্যে দেবী দুর্গার নয়টি রূপ (নবদুর্গা)-এর প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

নারীশক্তির উপাসনা: নারীশক্তি ও সৃষ্টিকে সম্মান জানানোর এক মাধ্যম।

শাস্ত্রের উল্লেখ: দেবীপুরাণে ১-১৬ বছর বয়সী কুমারী বালিকাদের পূজা করার নির্দেশ রয়েছে।

পূজার নিয়ম:
১-১৬ বছরের অবিবাহিতা কুমারী বালিকাকে নির্বাচন করা হয়।

অষ্টমী বা নবমী তিথিতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

কুমারী বালিকাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করা হয়।

গুরুত্ব:
নারীকে সম্মান জানানোর বিশেষ প্রথা।

নারীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ও নারীজাগরণের প্রতীক।

স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা:
১৯০১ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও বেলুড় মঠে নয়জন কুমারীর পূজা করেছিলেন।

কুমারী পূজা দুর্গাপূজার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

কুমারী পূজার ইতিহাস:
শাস্ত্রমতে: কোলাসুরকে বধ করার ঘটনায় কুমারী রূপে দেবীর আবির্ভাব।

প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ: মহাভারতে কুমারী পূজার উল্লেখ।

আধুনিক যুগ: স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় কাশ্মীরে ১৮৯৮ সালে এবং বেলুড় মঠে ১৯০১ সালে এর সূচনা।
তাৎপর্য:
কুমারী কন্যাকে জীবন্ত দেবী প্রতিমা হিসেবে পূজা।

নারীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য।

মন্ত্র ও ব্যবহার:
হৃদয় মন্ত্র: ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং হেসৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ

শির মন্ত্র: হৈং বৈং হ্রৈং শ্রীং হ্রীং ঐং স্বাহা শিরসে স্বাহা

শিখা মন্ত্র: ঐং হ্রীং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ।

শারদীয়া দুর্গাপূজা কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি বাঙালির সংস্কৃতি, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার মিলনস্থল। মহালয়া থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিটি দিনই মা দুর্গার প্রেম, ভক্তি ও করুণার আবহ সৃষ্টি করে।

কুমারী পূজা সেই ধারার এক অনন্য প্রকাশ, যেখানে কন্যা শিশুদের মধ্যে দেবী দুর্গার রূপে নারীশক্তিকে সম্মান জানানো হয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মা, কন্যা ও নারী– তিনিই শক্তির, সৌন্দর্যের ও করুণার প্রতীক।

তাই শারদীয়া পূজা ও কুমারী পূজা শুধুই আচার নয়, বরং জীবন্ত শক্তি ও মানবিক মূল্যবোধকে উদযাপনের এক মহৎ প্রতীক।

বাবা গনেশ

দীপক লাল কর্মকার

মর্ত্য থেকে ফিরেই গনেশ
মুখ করেছে ভার,
বলছে নাকি মামার বাড়ি
যাবেইনা সে আর!

শুঁড়েতে তার হাত বুলিয়ে
মাথায় দিয়ে চুমা,
রাগ করেনা সোনা বাবা
বলছে ডেকে উমা।

গনেশ তবু গোমরা মুখেই
গো ধরেছে ভারী,
মামার বাড়ির সাথে নাকি
বরাবরের আড়ি...

উমা শুধায় কি হয়েছে
বলতো ক্লিয়ার করে,
কেউ কি সেথায় তোর ভুঁড়িতে
চিমটি দিল জোড়ে?

সন্ধ্যা হলেই ক্লাবগুলোতে
চলছে নেশার রাজ,
প্রাণ খোলা সেই আড্ডা মজা
কেউ করেনা আজ।

ছোটোরা কেউ খায়না মোদক
মিষ্টি নাকি shit!!
ওদের কাছে পিৎজা নুডলস
এখন সুপার হিট।

উৎসব নয় এখন ওরা
ধর্ম নিয়েই মাতে,
মানুষ গুলো জাতের নামে
এ ওর মাথা কাটে।

একলা বসে প্যান্ডেলেতে
কান্না পেল ভারী,
হারিয়ে গেছে মা গো আমার
চেনা মামারবাড়ি...
উমার চোখও ভিজলো জলে
মনটা হল ভার,
ধর্ষিতা মেয়ে পায়নি বিচার
বছর হল পার...

শিক্ষা সেথা বিকোয় টাকায়
চাকরি জোটে ঘুষে,
জালিয়াতির আবর্জনা
ভাতাতে যায় মুছে।

অনেক হল মৌন থাকা
দেখেও ওদের খেলা,
এবার হবে নতুন করে
অসুর বধের পালা।

আয় মা উমা দশভূজা
রণংদেহী রূপে,
জ্বালিয়ে দে মা আগুন টুকু
বারুদ ভরা বুকে।

যে মাথারা ছিল নত
অত্যাচারের ভারে,
এবার তারা উঠুক জেগে
তীব্র হুঙ্কারে...

নিজ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার
সমন করুক জারি,
ওদের বুকে শক্তি দিতে
আয় মা বাপের বাড়ি...

কর্মে কেন অমানুষ

অশোক ধর

জন্ম হয় মানুষরূপে
কর্মে কেন হয় অমানুষ।
বলোরে মানুষ তোমরা বলো
কেনরে তোমরা হও অমানুষ?

কবিগুরু বলেছিলেন–
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয়
মানষ তারা মানুষ হয়
মানবিকতা না থাকলে
আসলে কি সে মানুষ হয়?

আল্লাহ, গড, ভগবান
মানুষরূপে পাঠায় মানুষ দুনিয়ায়
স্বার্থের কারণে ভুলের কারণে
কর্মে কেন হও অমানুষ?

কত গান কত কবিতা কত লেখা
জগতের জন্য পাঠিয়েছেন ভগবান
কেনরে মানুষ হও যে অমানুষ
বলতে পার বুঝতে পার
কর্মের কারণে তোমরা অমানুষ?

জন্ম হলে মৃত্যু হবে
এটাই হলো স্বাভাবিক
মানুষরূপে জন্ম হয়ে
কর্মে কেন হও অমানুষ?

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

কল সেন্টার-১৬৪৯৬

জরুরি গ্যাস সংক্রান্ত অভিযোগ কেন্দ্র (উত্তর) ০১৯৫৫৫০০৪৯৭, ০১৯৫৫৫০০৪৯৮

জরুরি গ্যাস সংক্রান্ত অভিযোগ কেন্দ্র (দক্ষিণ) ০১৯৫৫৫০০৪৯৯, ০১৯৫৫৫০০৫০০

আপনার রান্নার কাজ শেষ হয়ে থাকলে এক্ষুনি গ্যাসের চুলাটি নিভিয়ে ফেলুন	গ্যাস ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন এবং সময়মত গ্যাস বিল পরিশোধ করুন

গ্যাস অপচয় রোধে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধ করি, শিল্পোন্নত দেশ গড়ি।
- প্রয়োজন ছাড়া চুলা জ্বালিয়ে রেখে গ্যাস অপচয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎকে সংকটাপন্ন করছি।
- চুলা জ্বালানোর কমপক্ষে ২০ মিনিট পূর্বে রান্নাঘরের দরজা জানালা খুলে দিয়ে বায়ু চলাচল নিশ্চিত করুন।
- সার্বক্ষণিক চুলা জ্বালিয়ে রাখার কারণে অগ্নিকান্ডের মতো বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনছি।
- রান্না শেষে গ্যাসের চুলা নিভিয়ে ফেলুন, চুলার নবটি ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।
- প্রাকৃতিক গ্যাস যথাযথভাবে ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
- গ্যাস অপচয় রোধ করে এই সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।
- আপনার সচেতনতাই পারে গ্যাস অপচয় রোধ করতে।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত সীমিত, অফুরন্ত নয়।
- আগামী প্রজন্মের স্বার্থে গ্যাসের অপচয় রোধ করুণ এবং গ্যাস অপচয় রোধে অন্যকেও উৎসাহিত করুন।
- প্রয়োজন ছাড়া চুলা জ্বালিয়ে না রেখে মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাস সাশ্রয়ে নিজ নিজ নাগরিক/জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ

A scan+B scan+UBM+Pachymeter
VuPad
INNOVATION IN ULTRASOUND
YOU CAN SEE AND TOUCH
Sonomed, USA
Rexxam
Quality in vision care
SPM-700
Specular Microscope
Proudly Made in Japan
REVO FC
OCT | Fundus Camera
NEW AUTOMATED PERIMETERS
Fast and precise perimetry at your fingertips
OPTOPOL
technology, Poland
PTS 2000
IRIS ENTERPRISE
MEDICAL EQUIPMENT & DISPOSABLE
Concord Centre Point
14/A & 31/A, Tejkunipara, Suit # 12B, Farmgate, Dhaka-1215, Phone :41024412, Mobile: 01715-035693, 01726311097
E-mail: sahapk1968@gmail.com, iris1998.bd@gmail.com, Web: www.irisxenon.com

MTT
MAK Travel & Tours
(An International Travel & Tours Operator)
Nitai Chandra Manoal
Cell : +88 01711-523135
Arun Chandra Bhowmik
Cell : +88 01711-824144
Multiple option of every booking
Six staff to handle exclusively corporate customers
Separate staffs for major corporate houses
Quickly check process for every ticket issued in our premises
Deliver of documents at clients door steps
Service level agreement (Implant System)
Global contracts
Highly motivated and dedicated staffs
Customized statistical reports
Superior and personalized service
Advanced information technology
Hasan Plaza, (5th Floor) 53, Karwan Bazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh.
Phone : +88 02 41010690-691, E-mail: maktravels@gmail.com

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

সঙ্গীত কুমার ঘোষ

প্রমোদ রঞ্জন রায়

নেপাল দে

হীরালাল বাইন

প্রবীর কুমার সরকার

নমিতা চক্রবর্তী

রনধীর বিশ্বাস

মানিক লাল দাস

সুবিমল শিকদার

গৌর চন্দ্র ঘোষ

লিটন চন্দ্র দাস

মিলন কৃষ্ণ দাস

রতন কুমার মজুমদার

অমরেশ চন্দ্র দাস

উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য

কনিকা শর্মা

অনামিকা সাহা

মনিকা শর্মা

কনিকা রানী পাল

মিতালী রায় চৌধুরী

স্বর্ণা সেন

মিনি রানী কীর্ত্তনীয়

মিনতি শর্মা

মাধবী প্রভা দাস

শাশ্বতী নন্দী

চন্দন দেবনাথ

নির্মল কান্তি ওঝা

রাম প্রাসাদ

জয়শ্রী শর্মা

চঞ্চল চৌধুরী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

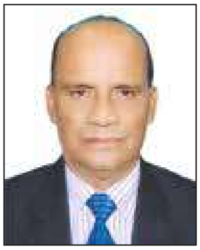
বিমল কৃষ্ণ দেব

আলোকা রাণী সরকার

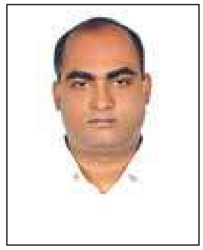
স্বপন দাস

রনজিৎ কুমার সরকার

উষা রাণী দত্ত

গোবিন্দ হালদার

রতন বিশ্বাস

সাগর মজুমদার

তনুশ্রী রাণী পাল

রতন কুমার মিত্র

ছোটন কুমার দে

তপন মিত্র

সুমন ঘোষ

প্রিয়লাল শর্মা

ইঞ্জি. সুব্রত দেবনাথ

ভবেশ কুমার শর্মা

রঞ্জিত কুমার নাথ

বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস

রীতা অধিকারী

অনন্যা রায় তমা

রিপন সাহা

দীপক কুমার দাস

গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস

নীতিশ কুমার দাশ

তাপসী ঘোষ

বিউটি রাণী ঘোষ

প্রদীপ কুমার পাল

পরিমল কুমার বিশ্বাস

রাজীব দাশ

গোপাল চন্দ্র দত্ত

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

শ্যামল কুমার দাস

দেবব্রত চক্রবর্তী

রত্না মোদক

লিপি কর্মকার

সংগীতা রায়

রিতা দেবনাথ

শ্রীমতি পলি বসাক

সুদেব কুমার পাল

সঞ্জয় মজুমদার

মৃণাল মণ্ডল

নিখিল চন্দ্র সাহা

সঞ্জীত কুমার রায়

সুবাস বালা

অঞ্জলী দেবী

আরতি ঘোষ

প্রিয়ম সাহা

অদ্রি সাহা

কণিকা মালাকার

খোকন মালাকার

বিথী রানী দাস

বিউটি রানী দাস

কার্তিক চন্দ্র দাস

দিনেশ দে

সেতু দে

গোপাল চন্দ্র বৈরাগী

মনিকা রানী দাস

অনীমা রাণী নাগ

অসীম রায়

ইন্দ্রা রানী মণ্ডল

ইতি রানী ঘটক

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

তপন কুমার হাজরা

স্মৃতি রানী সোম

সুনেত্রা রানী লক্ষ্মী

হৃদয় চন্দ্র দাস

সুশান্ত কুমার

দ্বীজেন্দ্র নাথ সাহা

স্মৃতি সরকার

সুম্পা মনি সরকার

নয়ন মাঝি

প্রনব কান্তি মণ্ডল

নারায়ণ চন্দ্র রায়

মুক্তি রাণী সরকার

নিউটন দাস

ফুলো সরকার

নন্দিনী দে

সুভাষ চন্দ্র মল্লিক

শিপুর কান্তি সুশীল

সুব্রত দে

রাখী রানী কর

স্বপন কুমার নন্দী

পরিমল পাল

মাধব চন্দ্র সাহা

মোকেশ পাল

যোগমায়া সাহা

দেবু চন্দ্র রায়

জয় চৌধুরী

সোহাগ দাস

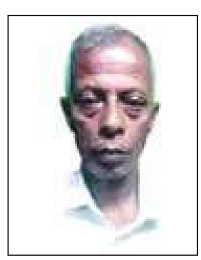
শেমল সরকার

উৎস দাস

নুপুর সাহা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

শুকলা রাণী বেপারী

সাগর দে

নিতাই সরকার

সেতু রাণী দে

চিত্ত রঞ্জন ঘোষ

তৃপ্তি রাণী সাহা

প্রদীপ কুমার দাস

প্রকৌ. চিনময় কান্তি গোলদার

ভুবন চন্দ্র দাস

মালবিকা বিশ্বাস

সঞ্জয় কুমার হাওলাদার

সুষমা বালা

তমা রাণী দাস

ধনরঞ্জন মল্লিক

বিদ্যুৎ চন্দ্র সাহা

প্রমা বালা

শতাব্দী দাস

অঞ্জলি ধর

অরিজিৎ কুমার ধর

মুক্তি রাণী দাস

স্মৃতি রাণী রায়

সবিতা সাহা

দিপিকা সাহা দিশা

প্রবীর কুমার বিশ্বাস

শিবু প্রসাদ মজুমদার

সম্পা রাণী দাস

শচীন্দ্র নাথ দত্ত

পিন্টু চন্দ্র বনিক

মহেশ চন্দ্র রায়

দিলীপ কুমার সাহা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

প্রমি বালা

পতী রাণী পাল

প্রদীপ কুমার বালা

প্রিতমা পাল লোপা

অনুপ কুমার মিত্র

অপূর্ব মন্ডল

হরশীত চন্দ্র হাওলাদার

দয়াল সাহা

নারায়ণ চন্দ্র সাহা

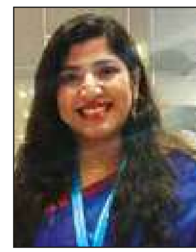
পূজা সাহা (ডল)

প্রতিমা সাহা

শুভা রাণী তরুনী দাস

বাসন্তী বিশ্বাস

অপর্ণা পাল

রেজিস্ট্রেশন চলমান...

“অপরাজিতা”-র বিগত সংখ্যার প্রচ্ছদসমূহ

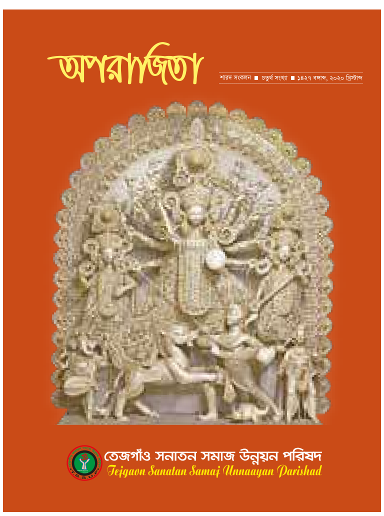

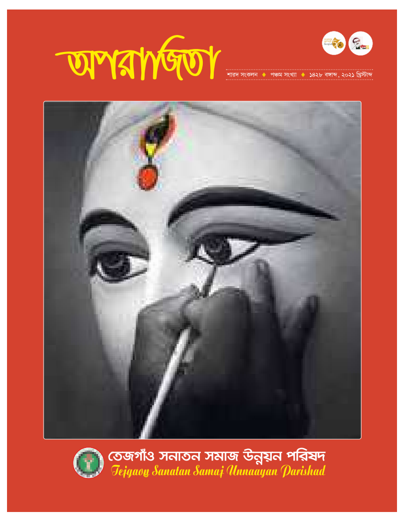

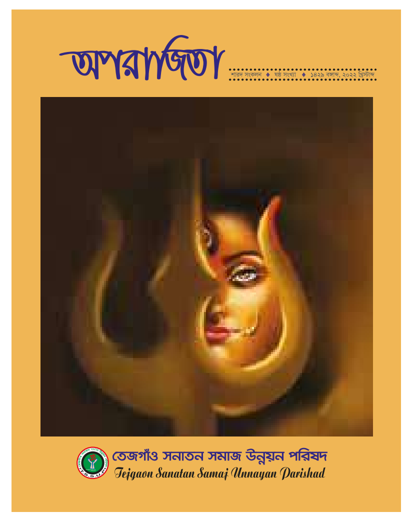

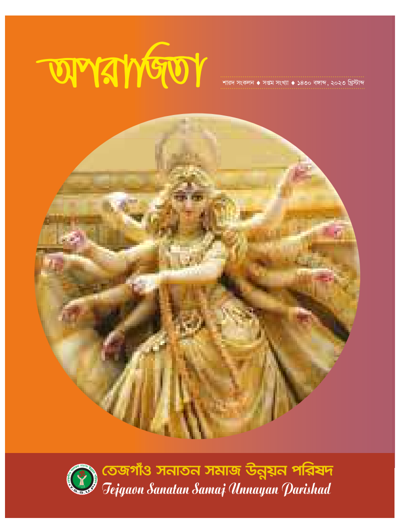

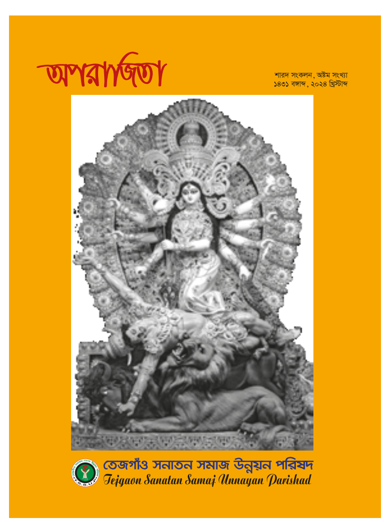

সিটি ব্যাংক পিএলসি
সিটি ব্যাংক সেন্টার
২৮ গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
১৬২৩৪ citybankplc.com
সিটি ব্যাংক
ইন্স্যুরেন্স করলে সিটি-তে সুরক্ষা পাবেন নিশ্চিতে
আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার পথটা হোক আরও নিশ্চিত। সারাদেশে সিটি ব্যাংকের যেকোনো শাখা ও উপশাখা থেকে এখন সহজেই নিতে পারবেন নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্স্যুরেন্স পলিসি।
সবচেয়ে বেশি ইন্স্যুরেন্স পার্টনার
সাধারণ ও শরিয়াহ ভিত্তিক ইন্স্যুরেন্স
দ্রুততম ও সহজ প্রসেসিং
নিরাপদ ভবিষ্যতের শুরু হোক এখনই।
বিস্তারিত জানতে আপনার নিকটস্থ সিটি ব্যাংক শাখা ভিজিট করুন অথবা QR কোড স্ক্যান করুন
সিটি ব্যাংকই ভরসা
লাইফ ইন্স্যুরেন্স পার্টনার
গার্ডিয়ান
নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স পার্টনার
city insurance

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৭ এর স্মরণিকা “অপরাজিতা”
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৮ এর স্মরণিকা “অপরাজিতা”
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৯-এর স্মরণিকা ‘অপরাজিতা’
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত

Md. Tazul Islam Kazal

Proprietor

শারদীয় শুভেচ্ছা

Prianka Syndicate

Customs Clearing & Forwarding Agent

Oishi Traders

General Importer

Dhaka Office :

Meherba Plaza
33, Topkhana Road
(6th Floor) Suit # L
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : +88 02 9550027
+88 02 9567416

Chattagram Office :

M. F. Tower (4th Floor)
57/60, Badamtoli Agrabad
Chattagram
Phone : 031-2516772-3
Mobile : +88 01713035961
+88 01711525198
E-mail : oishitraders@yahoo.com
E-mail : prsy1995@gmail.com

Western Union

গজে চড়ে দেবীর আগমন
শরতের প্রাতে বর্ণিল সাজে সাজুক প্রতিটি ক্ষণ

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে সবাইকে
শারদীয় দূর্গা পূজার শুভেচ্ছা